ভারতের উপকথা

(ওড়িশা পর্ব)

সম্পাদিকা

লীলা মজুমদার

মুখার্জী ব্রাদার্স । কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ

ফাল্গুন ১৩৬৭

প্রকাশক

সুকুমার মুখোপাধ্যায়

১৮এ, টেমার লেন

কলকাতা-৯

মুদ্রাকর

যামিনীভূষণ উকিল

দি মুকুল প্রিন্টিং ওয়ার্কস

২০৯এ, বিধান সরণী

কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী

খালেদ চৌধুরী

এক

নীলমাধব

সেকালে পুরীতে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি বড় ধার্মিক আর প্রজা-বৎসল ছিলেন। সমুদ্রের ধারে পুরী ; ওড়িশার লোকে এই শহরকে বলে শ্রীক্ষেত্র। এখনো পুরীকে লোকে খুব বড় তীর্থস্থান বলে জানে আর বহু দূর থেকে জগন্নাথদেবকে, তাঁর ভাই বলভদ্রকে আর বোন সুভদ্রাকে দেখতে আসে। পুরাকালে কিন্তু পুরীতে এই মন্দির ছিল না। তারপর ইন্দ্রদ্যুম্ন বড় সুন্দর মন্দির গড়লেন বটে, কিন্তু সেখানে কোনো দেবতার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন না। মনের মতো দেবতার জন্য অপেক্ষা করে রইলেন।

লোকে বলে একদিন গভীর রাতে ইন্দ্রদ্যুম্ন নীলমাধবের স্বপ্ন দেখলেন। নীলমাধব হলেন ওড়িশার প্রাচীন জাতি, শবরদের দেবতা। ওরা তাঁকে গোপনে পুজো করত। ঘন বনের ভিতর কোথায় যে তাঁর পীঠস্থান, সে-কথা পর্যন্ত কেউ জানত না। এই নীলমাধব ইন্দ্রদ্যুম্নের মন জুড়ে বসলেন। তিনি তাঁর বিশ্বাসী মন্ত্রী বিদ্যাপতিকে বললেন, "এই নীলমাধবকে আমার মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করব। তুমি যেমন করে পার তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো।"

বললেন বটে, "নিয়ে এসো।" কিন্তু নিয়ে আসা খুব সহজ কাজ ছিল না। বহু যুগ ধরে শবররা তাঁর পুজো করে আসছিল ; তাঁর গোপন স্থান খুঁজে বের করতে পারলেও, তারা প্রাণ দেবে তো দেবতা দেবে না। সেই পবিত্র বনের মধ্যে কোনো অপরিচিত মানুষের প্রবেশ নিষেধ ছিল।

তবু বিদ্যাপতি হতাশ হলেন না। নিজের পরিচয় গোপন করে তিনি শবরদের গ্রামে গেলেন। তাদের প্রধানের নাম ছিল বিশ্ববসু ; বিদ্যাপতি তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। এই বিদ্বান, নম্র, সুন্দর

যুবককে দেখে বিশ্ববসুর বড় ভাল লাগল। তিনি তাঁর মেয়ে ললিতার সঙ্গে বিদ্যাপতির বিয়ে দিলেন। বিয়ের পরেও বিদ্যাপতি শ্বশুর-বাড়িতে রইলেন। ললিতা তাঁকে যেমন শ্রদ্ধা করত, তেমনি ভালোবাসত। বিদ্যাপতি একদিন তাকে বললেন, "আমিও তোমাদের নীলমাধবের পুজো করব। আমাকে তাঁর মন্দিরে নিয়ে যেতে তোমার বাবাকে বল।"

বিশ্ববসু মহা সমস্যায় পড়লেন। বিদেশীকে তিনি কি করে নীলমাধবের মন্দিরের পথ দেখাবেন, সে যে ভয়ানক পাপ কাজ। শেষটা ললিতাকে বললেন, "বিদ্যাপতি আমার জামাই, সে যদি নীলমাধবের পুজো করে, আমার কি আপত্তি থাকতে পারে? তবে পীঠস্থানে যাবার পথ আমি তাকে দেখাতে পারব না। তাকে চোখ বেঁধে যেতে হবে।"

এ-কথা শুনে বিদ্যাপতি তখনি রাজি হয়ে গেলেন। চোখ বেঁধে দিয়ে, বিশ্ববসু তাঁকে নীলমাধবের পুজোবেদীর কাছে নিয়ে গেলেন। বিদ্যাপতি হাতের মুঠোয় কিছু পাকা সরষে নিয়ে চললেন। চলেন আর সমস্ত পথে দুটো চারটে করে সরষের দানা ফেলতে ফেলতে যান।

এমনি করে তাঁরা নীলমাধবের বেদীর সামনে পৌঁছলেন। চোখের বাঁধন খুলে দিতেই, বিদ্যাপতি দেখলেন একটি গাঢ় নীল পাথর, তার কোনো হাত-পা-মুখ-চোখ নেই, কিন্তু রূপে চারদিক আলো হয়ে আছে। বিদ্যাপতির মন ভক্তিতে পূর্ণ হল; তিনি নীলমাধবের পুজো করলেন। তারপর বিশ্ববসু আবার বিদ্যাপতির চোখ বেঁধে তাঁকে বনের বাইরে নিয়ে এলেন। বর্ষার জল পেয়েই সেই পাকা সরষের দানার শিকড় বেরুল, কচি পাতা হল। তারপর একদিন বিদ্যাপতি বিশ্ববসুর কাছে বিদায় নিয়ে, ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজধানীতে ফিরে এলেন। আসল কথা কেউ কিছু জানল না। রাজা আর তাঁর বিশ্বাসী মন্ত্রী ধৈর্য ধরে সরষে গাছে ফুল ফোটার সময় অবধি অপেক্ষা করলেন। ফুল ফোটার সময় এলে, গোপনে দুজনে

বনের মধ্যে গিয়ে দেখেন, হলুদ ফুলে পীঠস্থানে যাবার পথ আলো হয়ে আছে। রাতের অন্ধকারে তাঁরা সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন। সেই রাতে ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নে আবার নীলমাধবকে দেখলেন। নীলমাধব বললেন, "রাজা, আমি যেমন বলছি, তেমনি কর। এখানে আমার আর ভালো লাগছে না। দিনের পর দিন, যুগের পর যুগ, এদের ঐ কাঁচা ফল তরকারির ভোগে আমার অরুচি হয়ে গেছে। নীলমাধবের রূপ আমার আর ভালো লাগছে না। আমাকে তোমার মন্দিরে নিয়ে গিয়ে রান্না করা ভোগ দিও।" ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নে আরো শুনলেন নীলমাধব বলছেন, "নীলাচলে যাও। সেখানে দেখবে সমুদ্রের জলে একটি সুন্দর কাঠের টুকরো ভাসছে। তাকে জল থেকে তুলে নিয়ে যাও। ঐ কাঠ খোদাই করে আমার নতুন মূর্তি গড়। তার নাম হবে জগন্নাথ।"



ধড়মড় করে উঠে বসলেন ইন্দ্রদ্যুম্ন। চোখ খুলে দেখলেন বেদীর উপর নীল পাথরের নীলমাধব নেই। সূর্য ওঠার আগেই তাঁরা সেই বন ছেড়ে চলে গেলেন। গেলেন সোজা নীলাচলে। সেখানে দেখলেন তীরের কাছে সমুদ্রের জলে, সত্যি সত্যি সুন্দর এক টুকরো

কাঠ ভাসছে। রাজা ভক্তিভরে সেই কাঠটি তুলিয়ে পুরীতে নিয়ে গেলেন।

নীলমাধব আদেশ করেছেন, ঐ কাঠ খোদাই করে জগন্নাথের মূর্তি গড়তে হবে। তার জন্য উপযুক্ত কারিগর চাই। দেখতে দেখতে চারদিকে খবর রটে গেল রাজা একজন ভালো কারিগর চান। শত শত কারিগর ছুটে এল। কিন্তু ঐ কাঠের উপর কেউ বাটালির একটা দাগও কাটতে পারল না। জোর দিতে গেলেই বাটালি ভেঙে যেতে লাগল। রাজা প্রায় হতাশ হয়ে এলেন, এমন সময় অনন্ত মহারাণা বলে একজন বুড়ো কারিগর এসে বললেন, "মহারাজ, আমি মূর্তি গড়ে দেব, কিন্তু আমার কতকগুলো নিয়ম আছে। সেগুলি আপনাদের মেনে নিতে হবে। একুশ দিনে ঐ মূর্তি আমি শেষ করব, কিন্তু ঐ একুশ দিন আমার ঘরে কেউ আসবে না, কিংবা আমার কাজ দেখবার চেষ্টা করবে না। আমার ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিতে হবে, কেউ আমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখবে না।"

রাজা তাতেই রাজি হলেন। কাঠ, যন্ত্রপাতি আর যে-সমস্ত সরঞ্জাম লাগবে, সব নিয়ে অনন্ত তাঁর ঘরে ঢুকলেন। দরজা বাইরে থেকে বন্ধ হল। মাঝে মাঝে কৌতূহল চাপতে না পেরে, রাজা দরজায় কান পাততেন। ভিতর থেকে ঠুক-ঠাক ঘস-ঘস শব্দ শুনতে পেতেন। এমনি করে যখন প্রায় সময় হয়ে এসেছে, তখন ঘরের ভিতরের সব শব্দ বন্ধ হয়ে গেল।

রাজা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এত দিন কারিগর জলস্পর্শ করেননি, বুড়ো মানুষ, শেষটা যদি কোনো সাংঘাতিক বিপদ ঘটে থাকে! আর থাকতে না পেরে রাজা দরজা খোলালেন।

ভিতরে গিয়ে দেখলেন, কারিগরের চিহ্ন নেই, আছে শুধু তিনটি অ-সম্পূর্ণ মূর্তি। জগন্নাথ, বলভদ্র আর সুভদ্রা। আর সে কারিগরের দেখা পাওয়া গেল না। আজ পর্যন্ত পুরীর মন্দিরে সেইরকম অ-সম্পূর্ণ মূর্তির পুজো হয়।

দুই

চণ্ডাল রাজা

প্রতি বছর আষাঢ় মাসে পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে রথযাত্রার উৎসব হয়। ভারতের সব রাজ্য থেকে এই সময়ে তীর্থযাত্রীরা রথ দেখতে পুরীতে যান। সে এক এলাহি ব্যাপার। তিনটি প্রকাণ্ড কাঠের রথকে চমৎকার করে সাজানো হয়। তারপর শুভ মুহূর্ত এলে পাণ্ডারা মন্দিরের ভিতর থেকে জগন্নাথের, বলভদ্রের আর তাঁদের বোন সুভদ্রার কাঠের মূর্তিগুলি বের করে এনে, যার যার রথে বসিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেক ভক্ত পূজারীও রথে উঠে পড়েন।

তারপর শত শত ভক্ত মোটা মোটা দড়ি দিয়ে ঐ তিনটি রথ টেনে, মন্দিরের সামনের চওড়া রাজপথ দিয়ে প্রায় দুই মাইল দূরে জগন্নাথের বাগানবাড়িতে নিয়ে যান। এই বাগানবাড়িকে অনেকে মাসির বাড়িও বলেন। সেখানে দেবতারা তিনজন সাত দিন থাকেন। তারপর উল্টো রথের দিন, ভক্তরা আবার তাঁদের রথ টেনে মন্দিরে নিয়ে আসেন। শুধু পুরীতে নয়, সারা ভারতে ঐ সাত দিন উৎসব হয়, মেলা বসে, ফুল-ফল, গাছপালা বিক্রি হয়।

পুরীর রথযাত্রা দেখবার মতো জিনিস। সেকালে লোকে বলত রথের চাকার তলায় পড়ে মরলেও পুণ্য হয়। রথের সামান্য চাকরের কাজ করে দিতে পারলেও লোকে নিজেদের আজও ধন্য মনে করে। পুরীর রাজা নিজের হাতে সোনা দিয়ে বাঁধানো ঝাড়ু নিয়ে, রথ আর রথের সিঁড়ি ঝাঁট দেন! রাজারা নিজেদের ভগবানের সেবক মনে করেন। অনেক শো বছর আগে পুরুষোত্তম ছিলেন পুরীর রাজা। রূপে গুণে তাঁর তুলনা ছিল না, তার উপর বয়স ছিল কম আর দাক্ষিণাত্যে জয়যাত্রার ফলে বীর বলে তাঁর খ্যাতিও ছিল। রথের সময়ে তিনিও ঝাড়ু হাতে রথ ঝাঁট দিতেন।

সেকালে উৎকলের, অর্থাৎ ওড়িশার দক্ষিণে ছিল কাঞ্চি রাজ্য। সেখানকার রাজার মেয়ে পদ্মাবতী বড় সুন্দরী ছিলেন। তাঁকে একবার দেখে পুরুষোত্তমের মনে বাসনা হল, তাঁকে বিয়ে করেন। কাঞ্চির রাজার কাছে যথাবিধি বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো হল, তিনি আনন্দের সঙ্গে সে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। তারপর রথযাত্রার সময় পুরুষোত্তমের নিমন্ত্রণে তিনি পুরীতে এলেন।

মন্দিরের সামনে রাজার প্রাসাদ। সেখানকার উঁচু চত্বরে পাশাপাশি বসে দুই রাজা রথ-টানা দেখছিলেন। হাজার হাজার যাত্রীর ভিড়ে মন্দির থেকে বাগানবাড়ি অবধি সমস্ত পথটি গমগম করছিল। তারই মধ্যে শাঁখ বেজে উঠল, যাত্রীরা জয়ধ্বনি দিল। পাণ্ডারা ভক্তি-ভরে মূর্তি তিনটিকে মন্দিরের বাইরে এনে, যার যার রথে তুলে দিলেন।

তারপরেই পুরুষোত্তম উঠে গেলেন। কাঞ্চির রাজা অবাক হয়ে দেখলেন একটা সোনা বাঁধানো ঝাড়ু হাতে নিয়ে পুরুষোত্তম একটির পর একটি করে, তিনটি রথ ঝাঁট দিলেন। রথ ঝাঁট দেবার অর্থ যে পুরীর রাজারা ভগবানের দাস, কাঞ্চির রাজা সে-কথা বুঝতে না পেরে রাগে জ্বলে উঠলেন। এ কি, এ লোকটা কি রাজা, নাকি একটা চাকর, একটা ঝাড়ুদার!

মনের রাগ মনেই পুষে, রথযাত্রার পর কাঞ্চির রাজা দেশে ফিরে গেলেন। তারপর সেখান থেকে খবর পাঠালেন যে কাঞ্চির রাজারা চণ্ডালের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেয় না।

তাই শুনে পুরুষোত্তমও রেগে গেলেন। জগন্নাথের সেবা করেছে বলে যদি কাউকে চণ্ডাল বলা হয়, তাতে শুধু তার নয়, স্বয়ং জগন্নাথের অপমান হয় এমন দাম্ভিক লোককে কিঞ্চিৎ সাজা দেওয়া দরকার। কাঞ্চির সঙ্গে পুরুষোত্তম যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। দুঃখের বিষয়, সে যুদ্ধে পুরুষোত্তম হেরে গেলেন। সেটা ছিল রাগের যুদ্ধ! পরের বছর দেবতাদের পুজো করে, আশীর্বাদ ভিক্ষা করে, তবে পুরুষোত্তম যুদ্ধযাত্রা করলেন। এ হল ভক্তির যুদ্ধ।

সৈন্য নিয়ে কিছু দূর এগোবার পর, তাঁদের একজন গয়লানীর সঙ্গে দেখা হল। সে বলল, "আমার নাম মণিকা। রাজা, তোমার দুইজন সৈনিক তোমাদের আগে আগে গিয়েছে। একজনের কালো ঘোড়া, একজনের সাদা ঘোড়া। তাদের বড় জল-তেষ্টা পেয়েছিল, তাই আমার কাছ থেকে ঘোল কিনে খেয়েছিল। তাদের কাছে পয়সা ছিল না, তাই একজন হাত থেকে এই আংটি খুলে দিল। বলল তোমাকে দেখালেই তুমি পয়সা দেবে।"

আংটি দেখে রাজার রোমাঞ্চ হল। এ যে জগন্নাথ-দেবের আংটি। তিনি আর বলভদ্রই তাহলে আগে আগে গেছেন, রাজার হয়ে যুদ্ধ করবেন বলে। তবে আর ভাবনা কি? এ যুদ্ধে জয় নিশ্চিত। সাহসে বুক বেঁধে পুরুষোত্তম ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে চললেন। সে যুদ্ধে কাঞ্চির রাজা হেরে গেলেন।

যুদ্ধে জয়ী হয়ে, পুরুষোত্তম রাজধানীতে ফিরে এলেন। বন্দিনী করে পদ্মাবতীকে সঙ্গে আনলেন। তবু তাঁর মনের ঝাল মিটল না। মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, "রাজকুমারীর বাবা আমাকে চণ্ডাল বলে



অপমান করেছিলেন। এবার ওকে নিয়ে গিয়ে সত্যি সত্যি একজন ঝাড়ুদারের সঙ্গে বিয়ে দাও

রাজার রাগ দেখে মন্ত্রী শুধু বললেন, "বেশ, তাই হবে।" রাজার আদেশ শুনে তাঁর বড় দুঃখ হয়েছিল। তিনি বড় দয়ালু ও ধার্মিক ছিলেন। পদ্মাবতীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে স্ত্রীর আশ্রয়ে রেখে দিলেন। পদ্মাবতী তাঁদের মেয়ের মতো রইল। রাজা কিছু জানতে পারলেন না।

এমনি করে দিন গেল, মাস গেল। তারপর আবার রথযাত্রার সময় এল। প্রতি বছরের মতো এবারও সোনা বাঁধানো ঝাড়ু হাতে নিয়ে, পুরুষোত্তম রথের সিঁড়ি ঝাঁট দিতে লাগলেন। এমন সময় একজন পরমাসুন্দরী মেয়েকে নিয়ে মন্ত্রী এলেন। রাজা তাঁদের দেখে একটু আশ্চর্য হলেন।

মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, আপনি পদ্মাবতীর সঙ্গে একজন ঝাড়ুদারের বিয়ে দিতে বলেছিলেন। অনেক দিন ধরে খুঁজেও সে-রকম ভালো ঝাড়ুদার পেলাম না। এখন বুঝেছি আপনার চাইতে উপযুক্ত ঝাড়ুদার পাওয়া যাবে না। আপনার আদেশ পূর্ণ হক। ওকে আপনি বিবাহ করুন।"

মন্ত্রীর বুদ্ধি আর দুঃখিনী পদ্মাবতীর সুন্দর মুখ দেখে রাজার মন গলে গেল। কাঞ্চির রাজার উপর তাঁর সমস্ত রাগ দূর হয়ে গেল। মহা ঘটা করে পদ্মাবতীর সঙ্গে পুরুষোত্তমের বিয়ে হল।

আজ পর্যন্ত হাজার হাজার মুগ্ধ দর্শকের সামনে, পুরীর রাজারা দেবতাদের রথ ঝাঁট দেন।

তিন

লক্ষ্মীর জন্য

জগন্নাথই হলেন বিষ্ণু। পুরীতে তাঁর মন্দিরে রোজ ঘটা করে পুজো হয়, নানা রকম উপাদেয় ভোগ দেওয়া হয়। সেগুলি রান্না করবার নিয়মটিও অন্য সব জায়গা থেকে আলাদা। হাজার হাজার মানুষ রোজ সেই ভোগ ভক্তি ভরে কিনে নিয়ে যায়। সবাই বলে এমন ভোগ পৃথিবীতে আর কোথাও পাওয়া যায় না।

শুধু যে রান্নার নিয়ম নতুন ধরনের তাই নয়, জগন্নাথের মন্দিরের আরেকটি নিয়মও আছে, সেটি যেমন আশ্চর্য, তেমনি চমৎকার। জগন্নাথের প্রসাদ খাবার সময় জাত মানতে হয় না, ছোঁয়া-ছুঁয়ির বালাই নেই। এ রকম আশ্চর্য নিয়মও ভারতে আর কোনো হিন্দু মন্দিরে আছে কিনা সন্দেহ। এ বিষয়ে একটি চমৎকার গল্প শোনা যায়।

জগন্নাথই যখন বিষ্ণু, তখন মালক্ষ্মী যে তাঁর মন্দিরে আসবেন, সে তো জানা কথা। কিন্তু মা-লক্ষ্মীর কোনো জাত-বিচার নেই; যে তাঁর সাধনা করে, তিনি তার বাড়িতেই যান। এদিকে জগন্নাথের মন্দিরে সেকালে শুদ্ধাচার রক্ষা করে চলা হত। নিচু জাতের লোকদের কিছু ধরবার ছোঁবার নিয়ম ছিল না।

একদিন লক্ষ্মীর এ-রকম অনাচার সইতে না পেরে জগন্নাথ রাগ করে তাঁকে বললেন, "যে প্রদীপ জ্বেলে তোমাকে ডাকবে, তুমি অমনি তার বাড়িতে গিয়ে উঠবে, তা সে মুচি-ই হক, কি মেথর-ই হক, এ তোমার কি আচরণ? ও-সব তোমাকে ছাড়তে হবে।"

লক্ষ্মীও তেজের সঙ্গে উত্তর দিলেন, "ভক্ত আমার আরাধনা করবে আর আমি তার ডাকে সাড়া দেব না এ কখনো হতে পারে? তুমি ও-কথা বল না।"

জগন্নাথ মুখ গম্ভীর করে বললেন, "তাই যদি হয়, তাহলে এ মন্দিরে তোমার থাকা হয় না। তুমি এলে আমাদের ভোগ অপবিত্র হয়ে যাবে।"

লক্ষ্মী বললেন, "তাই হক। আমি মন্দির ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তুমি মনের সুখে ভোগ খেও, যদি পার।" এই বলে লক্ষ্মী মন্দির ছেড়ে চলে গেলেন। আকাশে, মাটিতে, পাতালে, তাঁর যত ভক্ত ছিল, দুঃখে সকলের বুক ভরে গেল। তাদের মধ্যে দেবতারাও ছিলেন। পবনদেব মা-লক্ষ্মীর এই অপমান সইতে পারলেন না। যতবার জগন্নাথের ভোগ সাজিয়ে দেওয়া হয়, এক কণাও মুখে পৌঁছবার আগে, তাঁর হাত থেকেই পবন উড়িয়ে নিয়ে যান। জগন্নাথ খেতে পান না।

তখন জগন্নাথের চৈতন্য হল। দুঃখে অনুতাপে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে, মা-লক্ষ্মীকে খুঁজতে বেরোলেন। তিনি যেখানেই থাকুন তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে, তাঁকে ফিরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু ফিরিয়ে আনা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। কৈলাস-পাহাড় থেকে আরম্ভ করে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও খুঁজতে জগন্নাথ বাকি রাখলেন না। তবু তাঁর সন্ধান পেলেন না; তাঁর সন্ধান দিতে পারে, এমন কাউকে দেখলেন না।

দিনের পর দিন না খেয়ে, জলপান না করে, জগন্নাথের শরীরের আর কিছু বাকি রইল না। খিদেয় কাতর হয়ে একটি ফল পর্যন্ত মুখে তুলতে পারতেন না। শেষটা অনাহারে অনুশোচনায় কাতর হয়ে জগন্নাথ আবার পুরীর সমুদ্রতীরে ফিরে এলেন।

তখন বেলা দুপুর হয়েছে। সমুদ্রের ধারের বালি তেতে উঠেছে। তার-ই উপর জগন্নাথ অবসন্ন হয়ে, বসে পড়লেন। যে-দিকে তাকালেন, চোখে অন্ধকার দেখলেন। এমন সময় একজন গরীব মানুষের তাঁকে দেখে দয়া হল। পরম ভক্তিতে, পরম স্নেহে সে তাঁকে গরম বালির উপর থেকে তুলে ঘরে নিয়ে গেল।

জগন্নাথের শরীর যতই ক্ষীণ হক না কেন, চারদিক তাঁর আলো

হয়ে রইল। গরীব মানুষটি শীতল জলে তাঁর হাত-পা ধুইয়ে দিয়ে বলল "প্রভু, আমি ব্রাহ্মণ তো নই, বাড়িতে আপনাকে কি খেতে দেব?"

বিষণ্ণ মুখে জগন্নাথ বললেন, "তুমি যা দেবে, আমি তাই গ্রহণ করব। কিন্তু আমার ওপর শাপ পড়েছে, আমার কিছু খাবার উপায় নেই।"

ভক্তটি বলল, "আমার মেয়ে বড় লক্ষ্মী, তার হাতের রান্না খেয়ে আপনার তৃপ্তি হতে পারে।" বলে, জগন্নাথকে নতুন আসনে বসিয়ে, সোনার মতো ঝকঝকে কাঁসার বাসনে সে তাঁর খাবার ব্যবস্থা করে দিল।

তার মেয়ে লাল পাড় জোলার শাড়ি পরে, সমুদ্রের শাঁখের বালা হাতে, মাথায় ঘোমটা দিয়ে, নিজের রান্না নিজে পরিবেশন করল। অনেক দিন পরে জগন্নাথ ভাত খেলেন।



পরে হাত মুখ ধুয়ে জগন্নাথ সেই মেয়ের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইলেন। বললেন, "তুমি আমার লক্ষ্মী, তোমাকে চিনতে আমার বাকি নেই। এখন থেকে আমার মন্দিরে সবাই আসবে, সবাই খাবে, কোনো জাত-বিচার করা চলবে না। কিন্তু তুমি না এলে, আমারই বা থেকে কি হবে?"

তখন মুখে হাসি, চোখে জল নিয়ে, লক্ষ্মী তাঁর সঙ্গে মন্দিরে ফিরে গেলেন। তাই জগন্নাথের মন্দিরে আজ পর্যন্ত সব জাতের লোক এক সঙ্গে প্রসাদ পায়।

এই সুন্দর গল্পটির নানান্ সংস্করণ শোনা যায়, সবগুলিরই মূল কথা হল দয়া, ক্ষমা, ভক্তি।

চার

ধর্মপদের কথা

পুরীর মন্দির তৈরির অনেক অনেক বছর পরে, পুরীর থেকে কিছু দূরে কোণার্কের সূর্য-মন্দির তৈরি হয়েছিল। এর মতো সুন্দর মন্দির শুধু ওড়িশায় কেন, ভারতের কোনো জায়গাতেই বিশেষ চোখে পড়ে না। অথচ মন্দিরটিতে এখন কৌতূহলী ভ্রমণকারীরা ছাড়া কেউ যায় না, ভক্তের ভিড় নেই, পুজো হয় না। চারদিকে বালির প্রান্তর, যে সমুদ্র এককালে মন্দিরের প্রায় পায়ের কাছে আছড়িয়ে পড়ত, সে এখন অনেক দূরে সরে গেছে। কিছুকাল আগেও যাতায়াতের বড়ই অসুবিধা ছিল, এখন মোটর যাবার রাস্তা হয়েছে, বড় বাসেরও ব্যবস্থা হয়েছে, যাত্রীদের থাকবার জায়গা হয়েছে। তবে এ-সব যাত্রীর অনেকে মন্দিরের কারুকাযের খ্যাতি শুনে দেশ-বিদেশ থেকে আসে, পুজো দিতে কেউ আসে না, পুজো দেবার বেদী আছে, তাতে সূযদেবের সাত ঘোড়ার মূর্তি খোদাই করা আছে, কিন্তু বিগ্রহ নেই।

এ বিষয়ে লোকে অনেক আশ্চর্য গল্পও বলে। নাকি প্রকাণ্ড চুম্বকের সাহায্যে শূন্যে ঝোলানো থাকত ধাতুর তৈরি মূর্তি, জলদস্যুরা চুরি করে নিয়ে গেছে। এ-সব গল্পের কোনো প্রমাণও কেউ দিতে পারে না, কিংবদন্তী ছাড়া কিছুই পওয়া যায় না। মন্দির তৈরি সম্বন্ধে কিছু তথ্য ঐতিহাসিকরা দিয়েছেন।

তাঁরা বলেন এই মন্দির তৈরি করেছিলেন নরসিংহদেব। বারোশো লোক বারো বছর খেটেছিল। দেশের সব চাইতে ভালো কারিগরদের যোগাড় করে এনে, রাজা সেই বারো বছরের মধ্যে এক বারও তাদের বাড়ি যাবার জন্য ছুটি দেননি। এই মন্দির তৈরি সম্বন্ধেও বড় করুণ একটি গল্প শোনা যায়।

প্রধান কারিগরের নাম ছিল বিশু মহারাণা। রাজা যখন তাঁকে

ডেকে নিয়ে গেলেন, ঘরে রইল তার অল্পবয়সী স্ত্রী। অল্প দিন পরেই তার ছেলে হবে। সেই ছেলে যখন জন্মাল, তাকে একবার দেখে আসার ছুটি পেল না বিশু। তারপর বারো বছর কেটে গেল, মন্দির তৈরি প্রায় শেষ হয়ে এল, তখনো বিশু একবারও বাড়ি যায়নি, ছেলে দেখেনি।

ছেলের মতো ছেলে সে, নাম তার ধর্মপদ। মায়ের চোখের মণি সে, যেমন আদর পায়, তেমনি শাসন ও শিক্ষা পায়। একটু বড় হলেই ওস্তাদের কাছে ধর্মপদ বাপের ব্যবসা শিখতে আরম্ভ করল। তার হাতের কাজ দেখে সকলে অবাক হল। দেখতে দেখতে মন্দির রচনার কাজে সে নিপুণ হয়ে উঠল। ধর্মপদ ছিল জাতশিল্পী, খুব ছোট বেলাতেও সে কাঠের উপর, পাথরের উপর খোদাই করে সুন্দর সুন্দর দুর্গ আর মন্দির তৈরি করত। সেই ছেলে যে ক্রমে ওস্তাদ কারিগর হয়ে উঠবে, তাতে আর আশ্চর্য কি।



গ্রামের পাঠশালায় ধর্মপদ লেখাপড়া শিখত, সেখানে মাঝে মাঝে তাকে বড় অপদস্থ হতে হত। একদিন ছেলেরা বলল কে জানে ও কি রকম লোকের ছেলে, ওর বাপকে তো কেউ দেখেননি।

ধর্মপদ মুখ কালো করে বাড়ি ফিরল। মা ওকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে, বল।" তখন ধর্মপদ তাঁকে সব কথা খুলে বলল। করুণ হেসে মা বললেন, "তোমার বাবার নাম বিশু মহারাণা, চন্দ্রভাগায় রাজার সূর্য-মন্দির তৈরি হচ্ছে। তিনি সেখানকার প্রধান কারিগর। বারো বছর রাজা তাঁকে ছুটি দেননি, তাই তুমি তাঁকে দেখনি। তোমার বাপের বংশ বিখ্যাত কারিগরের বংশ। সেকালে তাঁরা শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের মন্দির গড়েছিলেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তাদের পুরস্কার দিয়েছিলেন। তার অনেক কাল পরে তোমার পূর্ব-পুরুষরাই খণ্ডগিরির গুহা-মন্দির খোদাই করেছিলেন। রাজা ললাটেন্দু দেবের সময়ও তোমার পূর্বপুরুষরা একাম্রকাননের শিবমন্দির তৈরি করেছিলেন। তোমার নিজের ঠাকুরদা কটকের বড়বাটি দুর্গ করেছিলেন। বংশ নিয়ে তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত নয়, গর্ব হওয়া উচিত।"

ঐ সব জায়গায় প্রশংসা আজ পর্যন্ত শোনা যায়। শ্রীক্ষেত্র হল পুরী, একাম্রকানন হল ভুবনেশ্বর, বড়বাটির দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনো দেখা যায়।

মায়ের কাছে পূর্ব-পুরুষদের কথা শুনে, ধর্মপদ বলল, "আমি চন্দ্রভাগায় গিয়ে তীর্থও করব, বাবাকেও দেখব। তুমি ভেবো না, আমি বাবাকে দেখেই ফিরে আসব।" শেষ পর্যন্ত মা মত দিলেন। বললেন, "বাগান থেকে কিছু মিষ্টি কুল নিয়ে যাও, তোমার বাবা বড় ভালোবাসেন।" তারপর একদিন মাকে প্রণাম করে ধর্মপদ রওনা হল।

অনেকখানি পথ হেঁটে যাবার পর গায়ে সমুদ্রের হাওয়া লাগল। তারপর পথের দুই ধারে বালির স্তূপ আর ঝাউ গাছের সারি দেখে ধর্মপদের মন আনন্দে ভরে গেল। আরো কাছে যেতেই সমুদ্রের গর্জন কানে এল; ধর্মপদ দেখতে পেল বালির ওপর জেলেরা নৌকো উপুড় করে সদ্য ধরা মাছ ফেলেছে। তার পরেই চেয়ে দেখল নীল সমুদ্রের তীরে অপরূপ সূর্য-মন্দির।

কাছে গিয়ে দেখল মন্দিরের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এলেও, তখনো কিছু বাকি আছে। ব্যস্ত-সমস্তভাবে কারিগররা ঘুরে বেড়াচ্ছে, লোকজনের ভিড়! তার মধ্যে একটিও চেনা মুখ দেখতে না পেয়ে ধর্মপদ মুশকিলে পড়ল। কিন্তু বিশু মহারাণার নাম করতেই, তারা ওকে বাবার কাছে নিয়ে গেল। ছেলের পরিচয় পেয়েই বিশু তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। এই ছেলের মুখ দেখবে বলে সে বারো বছর অপেক্ষা করে আছে।

তারপর বাবার সঙ্গে ধর্মপদ মন্দির দেখতে গেল। তার মনে হল এমন মন্দির কেউ কখনো গড়েনি। বিশাল রথের আকারে মন্দির, তার চাকাগুলিতে অপূর্ব কারুকার্য, রথের ঘোড়াগুলিকে সত্যিকার ঘোড়া মনে হয়, প্রত্যেকটি পাথরে খোদাইয়ের কাজ, কোনো দুটি নক্শা এক নয়। হাতি, ঘোড়া, গাইয়ে-বাজিয়ে নর্তকীদের মূর্তি দিয়ে মন্দিরে, দেয়ালের আশ্চর্য শোভা খুলেছে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিশু মহারাণা বলল, "সবই হয়েছে ; রাজা যেমন চেয়েছিলেন এই সূর্য-মন্দির দেখে পৃথিবীর লোকের বিস্ময়ে বাক্‌রোধ হবে, তারই উপযুক্ত হয়েছে। শুধু একটা সমস্যা উঠেছে। মন্দিরের চুড়োর মুকুটটিকে কিছুতেই রাখা যাচ্ছে না। যতবার তোলা হচ্ছে, ততবার পড়ে যাচ্ছে। কোথাও কোনো ভুল হয়ে গেছে। মন্দির দেখে রাজা যেমন খুসি হয়েছিলেন, এই বিপদের জন্য তেমনি রাগ করেছেন। বলেছেন তিন দিনের মধ্যে মন্দিরের সব কাজ শেষ না হলে, সমস্ত কারিগরদের প্রাণদণ্ড দেবেন। কি যে করব, আমরা ভেবে পাচ্ছি না।"

ধর্মপদের মন খারাপ হয়ে গেল। কারিগররা সকলেই যখন পরামর্শ করতে বসেছিল, সে বিনীতভাবে বলল, "আপনারা যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

শুনে সকলে স্তম্ভিত। বলে কি ছোকরা! এতগুলি ওস্তাদ কারিগর যা পারল না, সে কাজ ঐটুকু ছেলে করে দেবে! তাছাড়া ধর যদি ও সত্যি মুকুটটা বসাতে পারে, তারপর রাজা যখন শুনবেন

যে এতগুলো বুড়ো কারিগরের মাথা হেঁট করে ঐ শিশু কাজ সম্পন্ন করেছে, তিনি কি আর আমাদের আস্ত রাখবেন ?

শেষ পর্যন্ত একজন প্রধান কারিগর বলল, "তবু চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি ? এমনিতেও তো আমরা ধনে-প্রাণে মরব, তার বাড়া আর কি হতে পারে ? ও যদি সত্যি মুকুট বসাতে পারে, তার চাইতে ভালো আর কি হতে পারে ?"

ধর্মপদ চেষ্টা করে দেখবার অনুমতি পেল।

পরদিন ভোরে উঠে সে মন্দিরের চারদিকে ঘুরে, প্রত্যেকটি কোণা ভালো করে পরীক্ষা করল। তারপর যন্ত্রপাতি নিয়ে সে মন্দিরের চুড়োয় উঠে গেল। সারাদিন কাজ করল সে, রাত হলেও নামল না, আলো জ্বেলে কাজ করে চলল। এদিকে বারোশো কারিগরেরও চোখে ঘুম নেই, তারা মন্দিরের পায়ের কাছে বসে দেবতাকে ডাকতে লাগল।

ভোর হলে তারা অবাক হয়ে দেখল, মন্দিরের চুড়োয় মুকুট বসেছে, নীল সমুদ্রের তীরে মন্দিরটি মুক্তোর মতো শোভা পাচ্ছে। তারপর ধর্মপদ নেমে এল, তার মুখখানি আনন্দে উদ্ভাসিত।

তাকে দেখে সকলে খুশি হল। তবু তার-ই মধ্যে একটা বিষাদের ছায়া দেখে ধর্মপদ জিজ্ঞাসা করল, "বলুন আপনাদের কিসের দুঃখ।"

তারা বলল, "তোমাকে রাজা পুরস্কার দেবেন বটে, কিন্তু আমাদের মতো অপদার্থ কারিগরদের নিশ্চয়ই প্রাণদণ্ড দেবেন।"

শুনে ধর্মপদ অবাক হয়ে বলল, "সে কি কথা ! এ মন্দির তো আপনারাই গড়েছেন, আমি শুধু চুড়োয় ঐ পাথরটুকু বসিয়েছি। আমার কোনো যোগ্যতা নেই, পুরস্কার আপনাদেরই প্রাপ্য।"

এই বলে মনের দুঃখে ধর্মপদ আবার চুড়োয় উঠে, সেখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে প্রাণ দিল। সকলে হায় হায় করে উঠল। বিশুর মনে হল তার বুকটা ফেটে যাচ্ছে। ধর্মপদের মা বৃথাই ছেলে ফিরে আসার দিন গুণলেন। আর ওড়িশার লোকে আজও ধর্মপদের কথা ভোলেনি।

পাঁচ

শিবেই সান্তারা

কোণার্কের মন্দির তৈরি সম্বন্ধে নানারকম সুন্দর গল্প শোনা যায়। সম্রাট নরসিংহদেবের প্রধান স্থপতির নাম ছিল শিবেই সান্তারা। তিনিই মন্দিরটির পরিকল্পনা করেছিলেন। স্থির হয়েছিল যে যেখানে চন্দ্রভাগা নদী সমুদ্রের কাছে এসে পড়াতে, তার জল খুব গভীর, সেইখানে মন্দির হবে। তার মানে চন্দ্রভাগা নদীকে বেঁধে তার উপর মন্দিরের ভিং তৈরি হবে।

শিবেই সান্তারা বড়ই মুশকিলে পড়ে গেলেন। হাজার হাজার গাড়ি বোঝাই পাথর এনে নদীর জলে ফেলতে বললেন। অনেক হাজার লোক সেই কাজে লেগে গেল। শান্তিময় নদীর ধার হট্টগোলে ভরে গেল। সূর্যোদয় থেকে কাজ শুরু হয়, সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ চলে, কিন্তু নদীর স্রোত যেমন ছিল তেমনি রইল। শিবেই তাজ্জব বনে গেলেন।

পণ্ডিতদের ডাকা হল। তাঁরা বললেন সমুদ্র থেকে বিশাল মাছ রাঘব এসে সব পাথর গিলে ফেলছে, তার বোধহয় ইচ্ছা নয় যে এখানে সূর্যমন্দির তৈরি হয়। একথা শুনে শিবেই একেবারে হতাশ হয়ে পড়লেন। এতদিন তিনি ভাবছিলেন তাঁর নিজের হিসাবে কোথাও ভুল হয়ে থাকবে, সেটি শুধরে নিলেই নদীকে বাঁধা যাবে। মানুষ হলেও কথা ছিল, কিন্তু রাঘব হল মানুষের উপরে, তার সঙ্গে তিনি পেরে উঠবেন কেন? তাছাড়া তাঁর স্থপতির মন এসব অলৌকিক ব্যাপার মানতেও চাইছিল না। এ বিষয়ে আরো অনেক চিন্তা করা দরকার। এই মনে করে তিনি একলা বেরিয়ে পড়লেন।

সমুদ্রের ধারে ধারে, গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ালেন শিবেই। শরীর রোগা হয়ে গেল, মুখে কালি পড়ল, চোখ বসে গেল, তবু সমস্যার

কোনো সমাধান পেলেন না। একদিন অবসন্ন দেহে একটা গাছতলায় বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময়ে ঘড়া ভরা জল নিয়ে এক বুড়ি সেই পথে যেতে যেতে, ঐভাবে ওঁকে পড়ে থাকতে দেখে, কাছে এসে তাঁর হাতে পায়ে জল ঢেলে, তাঁকে সুস্থ করে তুলল।

বুড়ির সঙ্গে গিয়ে শিবেই তার বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। বুড়ি তাঁকে বসিয়ে, অতিথির খাওয়ার আয়োজন করতে লাগল। একটু পরেই ঘন দুধে সুগন্ধী চাল সিদ্ধ হবার গন্ধে বাড়ি মো-মো করতে লাগল। মিছ্‌রি দিয়ে, এলাচদানা দিয়ে অতি উপাদেয় পায়েস রেঁধে শ্বেতপাথরের জামবাটি করে বুড়ি তাঁকে খেতে দিল।

খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছিল। কোনোরকমে হাত ধুয়ে, শিবেই বাটির মধ্যিখান থেকে এক মুঠো গরম পায়েস তুলেই, উ-হু-হু করে চেঁচিয়ে উঠলেন। চারটি আঙুলের আগায় বড় বড় ফোস্কা পড়ে গেছিল। বুড়ি ওঁর বোকামি দেখে মহা চটে গেল।



"ও কি রকম হল, বাছা? তুমিও দেখছি শিবেই সাস্তারার মতোই আহাম্মুক!" একথা শুনে শিবেই এমনি অবাক হয়ে গেলেন যে আঙুলের জ্বলুনির কথা ভুলে গেলেন। তারপর বুড়িকে জিজ্ঞাসা

করলেন, "শিবেই অতবড় নামজাদা স্থপতি, তাকে কেন আহাম্মুক বলছ, মা ?" বুড়ি হাসল। "বলব না আহাম্মুক ? তুমিও যেমন বাটির ধার থেকে পায়েস খেতে আরম্ভ না করে, দিলে মধ্যিখানে আঙুল ডুবিয়ে, গেল পুড়ে ! শিবেই যত বড় স্থপতি হক না কেন, ঘটে এক ফোঁটা সাধারণ বুদ্ধি নেই। আরে, নদী বাঁধতে হলে দুই তীর থেকে পাথর ফেলা শুরু করতে হয়, এটুকু বুদ্ধি হল না !"

শিবেই আর অপেক্ষা করলেন না। পায়েস ততক্ষণে ঠাণ্ডা, চেটেপুটে শেষ করে, হাত ধুয়েই, বুড়িকে ধন্যবাদ জানিয়ে, অমনি ছুটতে লাগলেন। তাঁর শরীরে মনে তখন একশো হাতির বল এসেছিল।

এবার আর কোনো ভুল হল না। নদীর দুই তীর থেকে গাড়ি গাড়ি পাথর ফেলে দেখতে দেখতে শক্ত ভিৎ তৈরি হয়ে গেল। একজন নিরক্ষর বুড়ির বুদ্ধিতে সেটা সম্ভব হল, অথচ তার নামও কেউ জানে না।

ছয়

বরুণের বর

ওড়িশা রাজ্যের ধারে ধারে অনেকখানি সমুদ্র-তীর। সেই সমুদ্র তীরের বিষয়ে নানান্ গল্প শোনা যায়। সমুদ্রের ধারে একটা ছোট গ্রাম, সেখানে মধুয়া বলে একটি লোক থাকত। সে এতই বোকা ছিল যে খুব সহজ কাজ দিলেও, সমস্ত ভণ্ডুল করে রাখত। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে সংসার চালাবার জন্য টাকাকড়ি রোজগার করা তাকে দিয়ে হত না। ভাগ্যিস ওর স্ত্রী ভারি বুদ্ধিমতী ছিল, সেই এখানে ওখানে টুকিটাকি কাজ করে খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করত।

একদিন স্ত্রী অসুখে পড়ল আর মধুয়া পড়ল মুশকিলে। আর কিছু না হক, রুগীর জন্য তো ওষুধ চাই, পথ্যি চাই। গেল সে চাকরির খোঁজে, কিন্তু ওর মতো নাম করা নিষ্কর্মাকে কেউ কাজ দিল না। মধুয়ার মন খারাপ হয়ে গেল। তবে কি সে বেঁচে থাকতে, চোখের সামনে ওর স্ত্রী ওষুধ পথ্যি না পেয়ে মরে যাবে? তার চাইতে নিজে মরাই ভালো। এই ভেবে মধুয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিল।

সমুদ্রের দেবতা কিন্তু ওর দুঃখ বুঝেছিলেন, তিনি একটা বড় ঢেউ পাঠিয়ে, মধুয়াকে নিরাপদে বালির তীরের উপর ফেললেন। মধুয়ার তখন অজ্ঞান অবস্থা। দেবতার দয়ায় এক ঝলক ঠাণ্ডা সমুদ্রের হাওয়া মুখে মাথায় লাগতেই, মধুয়া উঠে বসল। চোখ খুলে দেখে সামনে দাঁড়িয়ে লম্বা, সুন্দর, নীল রঙের এক মূর্তি। নীল শরীরের উপর বড় বড় মুক্তোর মালা শোভা পাচ্ছে। মধুয়া বুঝতে পারল ইনিই সমুদ্রের দেবতা বরুণ।

কানের কাছে শাঁখ ধরলে তার মধ্যে যেমন শব্দ শোনা যায়, সেইরকম কণ্ঠে বরুণ বললেন, "টাকাকড়ির চাইতে প্রাণের দাম অনেক বেশী, মধুয়া। অমন করে হেলায় প্রাণ দিতে হয় না। আমি জানি

তোমার টাকার দরকার; এই নাও, এই শাঁখটা ধর, এর কাছে যা চাইবে, তাই পাবে।"

দুই হাত পেতে মধুয়া শাঁখটি নিল, তারপরেই চোখ তুলে দেখে নীল সমুদ্রের জলে, নীল মানুষটি কখন মিলিয়ে গেছে। ছুটতে ছুটতে বাড়ি পৌঁছেই সে শাঁখের গুণের পরিচয় পেল। যেই না বলল, "ও শাঁখ, আমাকে একশোটা মোহর দাও!" সঙ্গে সঙ্গে টপ-টপ করে ঘরের মাটির মেঝেতে একশোটা মোহর পড়ল। মধুয়া তাই দিয়ে বদ্যি ডাকল, ওষুধ কিনল, খাবার কিনল। দেখতে দেখতে স্ত্রী সেরে উঠল।

এবার মধুয়ার কপাল ফিরে গেল। মাটির কুঁড়ের জায়গায় তার সুন্দর একটি বাড়ি হল। পরনের ত্যানা ছেড়ে, দুজনে ভালো কাপড়-চোপড় পরল। দু বেলা পেট ভরে খেল ওরা। দু হাতে গরীব-দুঃখীকে দানও করত। ওদের বাড়ি থেকে কেউ খালি হাতে ফিরত না।

কথাটা রাজার কানে উঠল। অমনি তিনি গুপ্তচর পাঠালেন মধুয়ার হঠাৎ বড়লোক হওয়ার রহস্য জানতে। মধুয়া সরল মানুষ, তার কাছ থেকে শাঁখের কথা বের করে নিতে তাদের খুব কষ্ট করতে হল না। রাতে এসে তারা শাঁখটি চুরি করে, রাজাকে দিয়ে এল।

শাঁখ হারিয়ে মধুয়ার দুর্দশার শেষ রইল না। যেটুকু টাকাকড়ি জমানো ছিল, তাও ক্রমে শেষ হয়ে গেল। নিজেরাও খেতে পেত না আর সব চাইতে দুঃখের কথা গরীবদের একটা কানাকড়িও দিতে পারত না। মধুয়া ভাবল এমন জীবন রেখে কি হবে?

আবার সে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে গেল, বরুণ আবার এসে বাধা দিলেন। সব কথা শুনে তিনি বললেন, "দুঃখ কর না। এবার তোমাকে আরো বড়, আরো ভালো একটা শাঁখ দেব। এ শাঁখের কাছে যা চাইবে, তার দশগুণ পাবে। এটি কিন্তু তোমার জন্য নয়। এটি রাজাকে দিয়ে, তোমার পুরনো শাঁখটি চেয়ে নিও। সেই শাঁখটি হাতে পেয়ে আর এক মুহূর্তও দেরি না করে, দেশ ছেড়ে চলে যেও।

দেবতার আদেশ মধুয়া পালন করল। রাজা বড় লোভী, ঐ ছোট শাঁখের বদলে এমন শাঁখ পাবেন, যার কাছে যা চাইবেন তার দশগুণ পাবেন শুনে তিনি সঙ্গে সঙ্গে মধুয়াকে তার পুরনো শাঁখটি ফিরিয়ে দিলেন। মধুয়াও তখনি শাঁখ নিয়ে সপরিবারে দেশ ছেড়ে চলে গেল।

এদিকে মধুয়াকে বিদায় দিয়েই রাজা বড় শাঁখকে বললেন, "আমাকে হীরে, মণি, মুক্তো দাও।" কি সর্বনাশ! বলবামাত্র শাঁখের ভিতর থেকে দুটি নীল হাত বেরিয়ে রাজার দুই গালে বিরাশী সিক্কা ওজনের দুই চড় কষিয়ে দিল আর শাঁখের মধ্যে থেকে কে যেন বলে উঠল, "ওরে লোভী রাজা, তোর এত টাকাকড়ি, তাতে তুই খুশি নস্! ঐ গরীব মানুষটার শাঁখটা চুরি করলি!! তোর যথেষ্ট আছে, তাতেই খুশি থাক্, নইলে বেশি লোভ করলেই চড় খাবি!" এই বলে হাত দুটি আর শাঁখটি বাতাসে মিলিয়ে গেল।

ভয়ের চোটে রাজা তখন চুপ করলেন বটে, কিন্তু স্বভাব যাবে কোথায়? মধুয়াকে ধরে আনবার জন্য তিনি পাইক-পেয়াদা পাঠালেন। তারা ফিরে এসে বলল মধুয়াকে কিংবা তার পরিবারের কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না।

এদিকে অনেক দূরে এক রাজ্যে গিয়ে মধুয়া আর তার স্ত্রী পরম সুখে সারা জীবন কাটাল। বরুণের দয়ায় তার বংশধরদেরও কোনো দুঃখ রইল না।

সাত

কেদার-ব্রত

সত্য যুগের লোকেরা সুখ সাফল্যের জন্য দেবতাদের ওপর নির্ভর করে থাকত। বিশেষ করে মেয়েরা; তারা ছোট ছোট দেবতাদের খুশি করবার জন্য নানারকম ব্রত আর পুজো করত। এই বিষয়ে নানারকম সুন্দর সুন্দর গল্প শোনা যায়।

সেকালে এক গরীব ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁর দুটি মেয়ে ছিল। তাদের নাম ছিল ভাগ্যবতী আর পুণ্যবতী। বাড়িতে এতই অভাব যে প্রায়ই হাঁড়ি চড়ত না। শেষটা দুই বোন বনের মধ্যে গিয়ে গোবর কুড়োতে আরম্ভ করল। গ্রামের গোরুর পাল বনে যেত চরতে, সেখানে গোবরের অভাব ছিল না। সেই গোবর ঝুড়ি করে বাড়িতে এনে ওরা ঘুঁটে দিত। ঘুঁটে বিক্রি করে যে সামান্য পয়সা পেত, তাই দিয়ে কোনো মতে ওরা খিদে মেটাত।

একদিন বনের মধ্যে গিয়ে তারা এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখল। দেব-কন্যারা কেদার-ব্রত পালন করছেন। ছেঁড়া কাপড় পরা সুন্দর দুটি মেয়েকে দেখে দেব-কন্যাদের দয়া হল। তাঁরা ওদের কাছে এসে বললেন, "তোমরাও এই কেদার-ব্রত পালন কর, দেখো তোমাদের সব দুঃখ কষ্ট ঘুচে যাবে, তোমাদের টাকাকড়ি হবে, বাড়ির সকলের মঙ্গল হবে।"

তাঁদের কথা শুনে ভাগ্যবতী আর পুণ্যবতী গভীর বনের মধ্যে জলাশয়ের ধারে ছেঁড়া কাপড়-চোপড় ছেড়ে রেখে, জলে নেমে ভালো করে স্নান করল। ময়লা শরীরে তো আর ব্রত পুজো করা যায় না। স্নান সেরে উঠে এসে দেখল, কোথায় তাদের ছেঁড়া ময়লা কাপড়? তার জায়গায় দুখানি অতি সুন্দর রেশমী শাড়ি রয়েছে।

দেবতাদের দান হাত পেতে তুলে নিয়ে, দুই বোন শাড়ি দুটি গায়ে দিল। অমনি তাদের রূপে চারদিক আলো হয়ে গেল।

কিন্তু ব্রত যে করবে, তার জিনিসপত্র কোথায় পাবে? ভাগ্যবতী আর পুণ্যবতী চেয়ে দেখল বনের চারদিকে পুজোর উপকরণ ছড়িয়ে আছে। তারা তখন সুপুরির বদলে বটফল দিয়ে, পানের বদলে বনলতার পাতা দিয়ে, বন থেকে একুশ রকম ফুল কুড়িয়ে, তাই দিয়ে নৈবেদ্য সাজাল। তারপর দুই বোনে ভক্তিভরে কেদারের পুজো করল।



পুজো সেরে মনে গভীর শান্তি নিয়ে তারা বাড়ি ফিরে এসে অবাক হয়ে গেল। কোথায় গেল তাদের ভাঙা-চোরা কুঁড়েঘর, যার দেয়াল ভরে ওরা কাল ঘুঁটে দিয়েছিল? তার জায়গায় কি সুন্দর বাড়ি, বাড়ির দেয়ালে নিরেট সোনার গোল গোল চাকতি বসানো।

দেখতে দেখতে ওদের কপাল ফিরে গেল। দেশের রাজা এসে বড় বোনকে আদর করে বিয়ে করে নিয়ে গেলেন। ছোট বোনকে বিয়ে করলেন মন্ত্রী। তারপর পরম সুখে সকলে দিন কাটাতে লাগলেন। রাণীর হাতে ব্রতের সুতো বাঁধা, রাজার সেটা পছন্দ নয়। তাঁর আদরের রাণী কেন মোটা সুতো হাতে বাঁধবেন? রাজা

সে সুতো খুলে ফেলে দিয়ে, তার জায়গায় সোনার সুতো বেঁধে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে রাজার বাড়িঘর, সোনাদানা, টাকাকড়ি সব কোথায় মিলিয়ে গেল। রাণীকে নিয়ে রাজা পথে দাঁড়ালেন।

তখন ছোট বোন পুণ্যবতী দিদিকে বলল, "কেদার ব্রতের পুজো ফেলে দিয়েই তোমাদের এই সর্বনাশ হয়েছে। তুমি আবার ভক্তি-ভরে ব্রত কর।"

তাই করলেন রাণী। আবার হাতে মোটা সুতো বাঁধলেন। আবার তাঁদের বাড়িঘর টাকাকড়ি হল। সব দেবতার দয়া।

আট

বজ্রমহাকালী

সত্য যুগে এক বণিক ছিলেন। তাঁর ধন-সম্পত্তির শেষ ছিল না। আর ছিল সাতটি রূপবান গুণবান ছেলে আর তাদের সাতটি সুন্দরী লক্ষ্মী বৌ।

বণিক বড় ধার্মিক ছিলেন। তাঁদের বাড়িতে দান-ধ্যান, পুজো ব্রত লেগেই থাকত। একবার তাঁর স্ত্রী বজ্রমহাকালীর ব্রত করবেন। বাড়িতে আট রকমের পিঠে-পুলি হবে। বজ্রমহাকালীকে ভোগ দেওয়া হবে। তার জন্য সুগন্ধী আতপ চাল এসেছে। ছোট বৌ খিড়কির পুকুরে গেছে চাল ধুয়ে আনতে।



চাল ধোয়া হলে, চালের ডালি পুকুর পাড়ে রেখে, ছোট বৌ আঁজলা ভরে জল খেল। সেই জলের সঙ্গে চালের দুটি দানাও তার পেটে গেল। বৌ টেরও পেল না। কিন্তু নিমেষের মধ্যে ঝড়ের মেঘ সঙ্গে করে মা কালী দেখা দিয়ে, ওর হাত ধরে ফেললেন। মা

কালী বললেন, "তুই ব্রতের চাল খেয়েছিস্, আমি তোর শাশুড়ীকে বলে দেব।"

তাই শুনে ছোট বৌ তাঁর পায়ে কেঁদে পড়ল, "মা কালী, তুমি যা বলবে, আমি তাই করব। কিন্তু আমার শাশুড়ীকে কিছু বল না, তাহলে আমার লজ্জার শেষ থাকবে না।"

মা কালী বললেন, "বেশ তাই হবে। আমি কাউকে কিছু বলব না, তার বদলে কিন্তু তোর যতগুলো ছেলেমেয়ে হবে, সব আমাকে দিতে হবে।" একথা শুনে ছোট বৌয়ের চোখ ফেটে জল এল, তবু সে বলল, "মা, তুমি যা-যা বলবে, তাই হবে, আমি তোমার দীন দাসী।"

চাল নিয়ে বৌ ঘরে এল, কেউ কিছু জানতেও পারল না। খুব ধুমধাম করে বজ্রমহাকালীর পুজো হয়ে গেল।

এর পর বছর প্রায় ঘুরে এল, তারপর ছোট বৌয়ের সুন্দর একটি ছেলে হল। সেইদিনই গভীর রাতে জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে মা-কালী ছেলেটিকে নিয়ে গেলেন। তারপর দেখতে দেখতে পাঁচ বছর কেটে গেল; প্রত্যেক বছর ছোট বৌয়ের একটি করে ছেলে হল আর রাতে এসে মা-কালী তাকে নিয়ে চলে গেলেন।

তার পরের বছর ছোট বৌয়ের আবার ছেলে হবে, এমন সময় তার শাশুড়ী তাকে গভীর রাতে যা-নয়-তাই বলে মেরে ধরে, বাড়ি থেকে বের করে দিল। বাইরে মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছিল, চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার, কোথায় ডাকাত আছে না বাঘ আছে কে জানে। তারই মধ্যে ছোট বৌ হাতড়ে হাতড়ে এগোতে লাগল আর কেবলি মা-কালীকেই ডাকতে লাগল।

তখন মা-কালী নিজে এসে দেখা দিলেন। ছোট বৌকে বুকে করে তিনি তাঁর মন্দিরে নিয়ে গেলেন। সেইখানে একটি ছোট ঘরে ছোট বৌয়ের অপরূপ সুন্দর একটি ছেলে হল। মা-কালী তাকে নিলেন না। কয়েকদিন পরে সঙ্গে চাকর-দাসী, নানারকম সুন্দর উপহার আর দেবদূতের মতো সুন্দর সাতটি ছেলে

দিয়ে, রুপো বাঁধানো পাল্‌কি করে তাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

সেখানে সব কথা শুনে সকলে হেসে কেঁদে আকুল হল। তারপর থেকে আরো ধুমধাম করে বজ্রমহাকালীর ব্রত পালন করা হত।

নয়

রাজার ছেলে, মন্ত্রীর ছেলে

রাজার ছেলে, মন্ত্রীর ছেলে গভীর বনে গেছিলেন শিকার করতে। বনে হিংস্র জানোয়ারের অভাব ছিল না, বাঘ, ভালুক, বুনো বরাহ। একটা বরাহের পিছন পিছন ছুটতে ছুটতে এক সময় রাজার ছেলে আর মন্ত্রীর ছেলে বুঝতে পারলেন, তাঁরা একেবারে বনের মধ্যিখানে পৌঁছেছেন, সঙ্গী-সাথীর কোনো সাড়াশব্দও পাওয়া যাচ্ছে না।

বনের ভিতর এমনিতেই সূর্যের আলো বেশি পৌঁছয় না, তার ওপর ততক্ষণে বিকেল হয়ে গেছিল, সূর্যও গাছের পিছনে হেলে পড়ছিল না। খুব বেশি দূর অবধি তাঁদের দৃষ্টিও পৌঁছচ্ছিল না। বরাহটাও আবছায়াতে কোথায় যে গা-ঢাকা দিয়েছিল, তাও ঠাওর হচ্ছিল না।

রাজার ছেলে, মন্ত্রীর ছেলে ঘোড়া থেকে নেমে, এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন, কোথাও যদি জলাশয় থাকে। এমন সময় থুথুড়ে বুড়ি লাঠি ঠুক্‌ঠুক করতে করতে এসে উপস্থিত হল। ওঁদের দেখে বুড়ি বলল, "আহা, কাদের বাছা গো তোমরা, এই ভর সন্ধ্যায় এমন অ জায়গায় এসে পড়েছ? এই কচি নরম শরীর নিয়ে ঘুরবার থান কি এটা?" এই বলে আঙুলের ডগা দিয়ে ওঁদের থুতনি ছুঁয়ে বুড়ি চুমো খেল।

রাজার ছেলে, মন্ত্রীর ছেলে বুড়িকে তাঁদের বিপদের কথা বলে একটু জল চাইলেন ; নিজেদের যদি বা জল ছাড়া চলে, ঘোড়া দুটির তো চলবে না। ফোক্‌লা হেসে বুড়ি বলল, "চল বাছা, আমার কুটিরে, পাৎকো আছে, ঘড়া আছে, দড়া আছে, যত খুশি জল খেও।" ওরা তাই শুনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

তবে খুব কাছে ছিল না বুড়ির বাড়ি। সেখানে যেতে যেতে

সন্ধ্যা হয়ে গেল, থেকে থেকে মেঘের গর্জন শোনা যেতে লাগল। ড়র বাড়ি পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টিও নামল।

কুটিরটি কিন্তু মন্দ না, একটা থাকার ঘর, একটা রান্নাঘর, পাশে খালি গোয়ালঘর, সেখানে খড়ের গাদা। বাড়ির পাশে পাৎকো; দাওয়ার ওপর জালায় করে জল তুলে রাখা ছিল। ওঁরা দুজনে প্রাণভরে জল খেলেন, ঘোড়া দুটিকে গোয়ালঘরে নিয়ে গিয়ে খড় দিয়ে তাদের গায়ের জল মুছিয়ে দিলেন। বুড়ি তাঁদের বসিয়ে, ঘোড়াদের জল খেতে দিতে গেল।



ফিরে এসে বুড়ি রান্না চড়াল, তার ছেলেদের বাড়ি ফেরার সময় হয়ে এসেছিল, তাদের বেজায় খিদে। এদিকে বৃষ্টি থেমে গেল, গাছের ফাঁক দিয়ে তারার আলো দেখা যেতে লাগল। রাজার ছেলে, মন্ত্রীর ছেলেও উঠে পড়লেন। যাবার আগে বিদায় নেবার জন্য বুড়ির খোঁজে রান্নাঘরে উঁকি মেরে তাঁদের চক্ষুস্থির! চ্যালা কাঠের বদলে উনুনের তলায় নিজের ঠ্যাং জ্বালিয়ে বুড়ি দিব্যি রান্না করছে!!

এক নিমেষে তাঁরা বুঝে নিলেন এ বুড়ি তাহলে সত্যিকার মানুষ নয়, রাক্ষসী-টাক্ষসী হবে। আর এক মুহূর্তও দেরি করা নয়। পড়ি-

মরি করে গোয়ালঘরে ছুটে গিয়ে, ঘোড়ার পিঠে চেপে তাঁরা রওনা দিলেন। ছোটেন আর পিছন ফিরে দেখেন বুড়ি ধাওয়া করল কি না।

বুড়ি কিন্তু ধাওয়া করেননি। ওঁদের তাড়াহুড়ো দেখে শুধু একটু মুচ্‌কি হেসে রান্নায় মন দিয়েছিল। ধাওয়া করার তার দরকার ছিল না। ঘোড়াদের জল দেবার সময়, তাদের ল্যাজের সঙ্গে সে ফুটো করা দুই থলি পাকা সরষে বেঁধে দিয়েছিল। ঘোড়াও ছুটেছিল আর সারা পথ সরষের দানাও ছিটিয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। আর শুধু তাই নয়, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সরষের কল বেরুল, শিকড় হল, পাতা হল, গাছ হল, কুঁড়ি হল, ফুল হল, চারদিক হলুদে হলুদ হল। বুড়ির ছয় ছেলে বাড়ি ফিরে, কচি মাংস এই বুঝি হাতছাড়া হল, এই ভেবে রাজার ছেলের, মন্ত্রীর ছেলের পিছু নিল।

প্রায় যখন তাঁদের ধরে ফেলে মন্ত্রীর ছেলে তাঁর গুরুর দেওয়া মন্ত্র পড়লেন। অমনি চারদিক ঘন কুয়াশায় ভরে গেল। রাক্ষসরা পথ দেখতে পায় না, হাতড়ে হাতড়ে এগোতে হয়; রাজার ছেলে, মন্ত্রীর ছেলে আরো কয়েক ক্রোশ এগিয়ে যান।

খানিক বাদে রাক্ষসরা আবার তাঁদের ধরে ধরে, মন্ত্রীর ছেলে আবার মন্ত্র পড়েন। অমনি সমস্ত পথ কাঁটাবনে ভরে যায়। রাক্ষসরা দাঁত দিয়ে কেটে, নখ দিয়ে ছিঁড়ে কাঁটাবন পার হয়। রাজার ছেলে, মন্ত্রীর ছেলে আরো অনেকটা দূরে চলে যান।

আবার যখন তারা কাছাকাছি এসে যায় মন্ত্রীর ছেলে মন্ত্র পড়েন, মধ্যিখানে আগুন জ্বলে ওঠে। থুতু ফেলে অনেক কষ্টে তারা আগুন নেবায়। তারপর জলের ঢেউ এসে তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সাঁতরে তারা আবার তাঁদের পিছু নেয়।

তখন মন্ত্রীর ছেলে আবার মন্ত্র পড়েন। পথের ধারে বুড়ো আমগাছ দুই ভাগ হয়ে যায়, তাঁরা ভিতরে লুকোন। রাক্ষসরাও সহজে ছাড়ে না, সবাই মিলে গাছ ধরে উপড়ে আনার চেষ্টা করে। অমনি গাছে ফুল ফোটে। ফুল ঝরে, গুটি ধরে। গুটি বড় হয়, দুটি

আম পাকে। সেই আম ছুটি টুপ করে গাছের পাশে পুকুরের জলে পড়ে। অমনি কোথা থেকে মস্ত রুই মাছ এসে আম ছুটিকে গিলে ফেলে।

মস্ত পুকুর। এপার-ওপার দেখা যায় না, আম খেয়ে মাছটা সাঁতারে ওপারে গিয়ে ওঠে। সেখানে জেলেরা বেড়া-জাল ফেলে মাছ ধরছিল। রুইমাছ তাদের জালে পড়ল। অত বড় মাছটা দেখে জেলেরা সেটি রাজার কাছে ভেট দিল।

রাজবাড়ির রান্নাঘরে যেই না দাসীরা বড় বঁটি দিয়ে কুচ করে মাছের মুড়োটি আল্‌গা করেছে, ভিতর থেকে রাঙা টুকটুকে ছুটি আম বেরিয়েছে। সেই আম মাটিতে পড়তেই ফেটে গেল আর রাজার ছেলে মন্ত্রীর ছেলে বেরিয়ে পড়ে বললেন, "বরা পাওয়া গেল না!"

দশ

রাখাল আর ডাইনীবুড়ি

এক গাঁয়ে এক রাখাল ছিল। তার নাম রামু। সে রোজ গ্রামের লোকদের গোরু চরিয়ে আনত; তার জন্য পয়সাও পেত, আবার লোকের বাড়িতে পিঠে-পুলি হলে, ছেলেমানুষ বলে তার ভাগও পেত।

যখন আমগাছে বোল আসে, তখন লোকে বকুল অমাবস্যার উৎসব করে। নানা রকম মিষ্টি তৈরি করে, সেগুলিকে আমের মুকুল দিয়ে সাজিয়ে, সেদিন দেবতাদের ভোগ দেওয়া হয়। সকাল বেলায় গোরু আনতে যার বাড়িই যায় রামু, সে-ই তাকে হাত ভরে পিঠে-পুলি দেয়। কোঁচড় ভরে গেল, অত মিষ্টি রাখে কোথায়?

এক দৌড়ে বাড়ি গিয়ে অর্ধেক পিঠে মাকে দিয়ে, বাকি পিঠে সঙ্গে নিয়ে রামু মাঠে গেল। গোরুগুলো ঘাস খেল, রামু খেল পিঠে। বটগাছের ছায়ায় বসে, খেয়ে খেয়ে যখন আর খেতে পারে না, তখন রামুর একটা মজার কথা মনে হল।

বটগাছের কাছে একটা ভালো জায়গা দেখে, শেষ পিঠেটাকে যত্ন করে মাটিতে পুঁতে রামু বলল, "ওরে পিঠে, লাগল মিঠে, শিকড় বেরুক তোর কাল সকালে, গাছ না গজালে, রাগ হবে মোর।"

বিকেলবেলায় অন্য দিনের মতো রামু গোরু নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। পরদিন সকালে আবার গোরু নিয়ে সে যখন মাঠে গেল। পিঠেটার কথা তার মনেও ছিল না। দুপুরবেলায় হঠাৎ সে-কথা মনে পড়াতে, কাছে গিয়ে দেখল, ওমা! সত্যি সত্যি পিঠের সবুজ কলি বেরিয়েছে। রামু যেমনি অবাক, তেমনি খুশি। তবু পিঠে গাছকে বলল, "কাল গোছা গোছা পাতা না দেখলে তোকে কেটে ফেলব।"

পরদিন গিয়ে দেখে পিঠে-গাছের ডালপালা বেরিয়েছে, তাতে গোছা গোছা সবুজ পাতা। রামু বলল, "কাল যদি ডাল থেকে পিঠে না ঝোলে তো তোকে কুপিয়ে শেষ করব।"

তার পরদিন মাঠে গিয়ে রামু দেখল পিঠে গাছের ডাল-পালা দোতলার সমান উঁচু হয়ে গেছে আর তাতে থোলো থোলো পিঠে টুপ্‌টুপ্ করছে। আর যায় কোথায়! খচমচ করে উঁচু ডালে উঠে পড়ল রামু। তারপর গাছ থেকে পিঠে পাড়া আর খাওয়া! নিজে তো পেট ভরে খেলই, কোঁচড়ে করে মায়ের জন্যও নিয়ে গেল।



এর পর থেকে রোজ রামু পিঠে-গাছের পিঠে খেত আর পর দিন গিয়ে দেখত ডালে ডালে নতুন পিঠে ফলে রয়েছে। মনের আনন্দে গাছে বসে গলা ছেড়ে গান গাইত রামু আর টপাটপ্ পিঠে খেত।

একদিন এক ডাইনী-বুড়ির সেদিকে চোখ পড়ল। পিঠের উপর বুড়ির এতটুকু লোভ ছিল না, কিন্তু রামুর পিঠে-খাওয়া নধর শরীর দেখে তার জিবে জল আসছিল।

ঝুড়ি মাথায় ভালো মানুষ বুড়ি সেজে ডাইনী গাছতলায় দাঁড়িয়ে, রামুকে ডেকে বলল, "সব পিঠেগুলো একলা খাবি, বাপ? বুড়ি মাকে একটাও দিবিনে?"

রামু বলল, "কি যে বল বুড়ি-মা! গাছভরা পিঠে ঝুলছে, যত চাও পেড়ে খাও!"

বুড়ি বলল, "খাও বললেই খেতে পারছি কোথায়? চোখে দেখি না, হাত-পা কাঁপে। লক্ষ্মী বাপ, দু-চারটি পেড়ে দে।"

রামু গাছের ডাল ধরে ঝাঁকাতেই অনেকগুলো পিঠে মাটিতে পড়ল। "ঐ নাও, খাও বুড়িমা।"

বুড়ি বলল, "এ-রাম! ওগুলো মাটিতে পড়ে মাটি লেগে ময়লা হয়ে গেছে। ও কি খাওয়া যায় নাকি? দে বাপ, হাতে করে দে; কাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি। না দিবি তো বল্, চলে যাই। বুড়ি মলে তোর আর কি এসে যায় বল্!"

এই বলে ঠক-ঠক করতে করতে বুড়ি ফিরে চলল। তাই দেখে রামুর ভারি দুঃখ হল। সে নিচের ডালে নেমে এসে গোটা চারেক পিঠে পেড়ে, হাত বাড়িয়ে বলল, "এই নাও, বুড়িমা, ধর!"

ধরবি তো ধর, বুড়ি অমনি ওর হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে ওকে মাটিতে নামিয়ে এনে, সঙ্গে সঙ্গে মস্ত একটা ছালায় ভরে ফেলল তারপর ছালার মুখ বেঁধে, ঝুড়িতে ফেলে রওনা দিল। রামু এতটুকু টঁ্যা-ফুঁ করবার সময় পেল না।

এদিকে মাথার ওপর ঝাঁ-ঝাঁ রোদ, তায় ঐ ভারি বোঝা নিয়ে যেতে যেতে বুড়ির বেজায় জল তেষ্টা পেল। পথ থেকে একটু দূরে একটা ছোট নদী বয়ে যাচ্ছিল। মাথার ঝুড়ি মাটিতে নামিয়ে, বুড়ি কপালের ঘাম মুছল। পাশে কলাইয়ের খেতে কয়েকজন লোক কাজ করছিল; বুড়ি তাদের ডেকে বলল, "বাছারা, আমার ঝুড়িটা একটু দেখো। আমি নদী থেকে জল খেয়ে আসছি।"

বুড়ি চলে যেতেই থলির ভিতর থেকে রামু প্রাণপণে চ্যাচাতে লাগল, "আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! তাই শুনে খেতের লোকগুলো তো অবাক! তাড়াতাড়ি এসে তারা ছালাটার মুখ খুলে ফেলল। রামুর কাছে সব কথা শুনে তারা বলল, "শীগগির ঐ ঝোপে গিয়ে লুকো, বুড়ি এল বলে!" রামু লুকোলে, ওরা

ছালার মধ্যে কতকগুলো পাথর পুরে, ছালার মুখ আবার বেঁধে, যেমনকে তেমন ঝুড়িতে রেখে, নিজেদের কাজে মন দিল, যেন কিছুই হয়নি।

বুড়ি কিছুই টের পেল না। ঝুড়ি মাথায় নিয়ে, বাড় গিয়ে মেয়েকে বলল, "নে ধর্, এতে মাংস আছে, রেঁধে রাখ্। আমি পুকুর থেকে নেয়ে এসে খাব।"

মেয়েটা ছালা খুলে পাথর দেখে অবাক হল। মা চান করে এলে বলল, "এই পাথরের ঝোল রাঁধতে হবে নাকি?" বুড়ি তো পাথর দেখে অবাক। "দেখেছিস, হতভাগা কোন ফাঁকে পালিয়েছে! দাঁড়া, এর পরের বার কেমন করে পালায় দেখে নেব।"

কয়েক দিন পরে ভিখিরি মেয়ে সেজে বুড়ি আবার পিঠে গাছের তলায় গেল। রামু গাছে চড়ে মহা আনন্দে পিঠে খাচ্ছিল। ডাইনী বলল, "দে না বাছা, গোটাকতক। খেতে পাইনে, এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে ঘুরে মরি।"

রামু বলল, "বটে! তুই আবার এসেছিস্? কিছু দেব না তোকে! গতবার নেহাত কপালজোরে বেঁচে গেছিলাম। আর আমার চোখে ধুলো দিতে পারবি না! যা, ভাগ্!"

দুচোখ কপালে তুলে, ডাইনী বলল, "ওমা, বলে কি! আমি বাছা কোনো জন্মেও এর আগে এ-পথে আসিনি! কার সঙ্গে আমায় ভুল করছিস্ রে?"

রামু ভিখিরি মেয়েকে ভালো করে দেখে ভাবল, "কি জানি, হয়তো সত্যিই তাই, এ হয়তো অন্য কেউ। তবু সাবধানের মার নেই!" এই ভেবে একটা ডাল এক হাতে আঁকড়ে ধরে অন্য হাতে কয়েকটা পিঠে বাড়িয়ে দিল। ডাইনী বুড়ি হ্যাচ্কা টানে ডাল ভেঙে ছেলেটাকে নামিয়ে নিয়ে, হাত-পা বেঁধে ঝোলায় পুরে, সটাং বাড়ি গিয়ে তবে থামল।

বাড়ি পৌঁছে মেয়েকে বলল, "রান্নার যোগাড় দে, আমি জ্বালানি কাঠ কুড়িয়ে আনি।"

ডাইনী বুড়ি বাড়ির বার হবামাত্র মেয়েটা ঝোলার মুখ খুলে ফেলল। ভিতরে দেখল একটা সুন্দর ছেলে, মাথাভরা তার কালো কোঁকড়া চুল।

মেয়ে বলল, "হ্যাগা, অমন চুল তোমার হল কি করে?" রামু বলল, "তা আমি বলব কেন? তুমি তো এক্ষুণি আমাকে কুটে রাঁধবে।" মেয়ে বলল, "চুলের রহস্য বল তো তোমাকে ছেড়ে দিই।" এই বলে রামুর হাত-পার বাঁধন খুলে দিল।

রামু বলল, "রোজ রাতে শোবার আগে মাথায় খুব করে ছাগলের দুধ ঘষলেই এই রকম চুল হয়।" বলেই দে ছুট।

ডাইনী বুড়ি জ্বালানি কাঠ নিয়ে ফিরতেই, মেয়ে বলল, "ওমা, ও কেমন ধারা ছেলে গো? ঘরে বন্ধ করে রেখে মসলা বাটছি আর কোন ফাঁকে জানলা ভেঙে পালিয়েছে!" শুনে বুড়ির রাগ দেখে কে! প্রথমে তো মেয়েটাকে বেদম পিটল, তারপর ঝোলা নিয়ে, গৃহস্থের বৌ সেজে আবার গেল পিঠেগাছ-তলায়।

দে বাবা কটা পিঠে, ছেলেপুলেগুলো খাবে? রামুর কিন্তু তাকে চিনতে বাকি রইল না। সে বলল, "আগে নিজে চেখে দেখ, তারপর নিও। দেখি, হাঁ কর দিকিনি।" ডাইনীবুড়ি অমনি হাঁ করেছে আর রামু সেই হাঁ করা মুখের মধ্যে দিয়েছে ফেলে শান দেওয়া এক বর্শা! বর্শাটা গলা দিয়ে নেমে একেবারে বুকে বিঁধে গেল আর দুষ্টু ডাইনীবুড়িও মরে গেল।

এগারো

কুঁড়ে বামুনের সৌভাগ্য

অনেক কাল আগে এক গরীব বামুন ছিল, সে রোজ এর বাড়ি ওর বাড়ি ভিক্ষে করে নিজের বুড়ি মায়ের আর নিজের ভাত যোগাড় করত।

একদিন এমনি তার মন্দ কপাল যে এক মুঠো চালও কেউ দিল না। মনের দুঃখে বামুন বলল, "নাঃ, আজ কিছুতেই খালি হাতে ফিরব না।" এই ভেবে সে অন্য পথ ধরল।

কিছু দূর গিয়ে দেখল একটা বড় পুকুর, তার টলটলে জল। বামুনের যেমন খিদে, তেমনি তেষ্টা পেয়েছিল। ঐরকম ফটিকের মতো জল দেখে সে ভাবল, "খেতে না হয় না-ই পেলাম, এই টলটলে জল দিয়ে তেষ্টা মেটাই তো!"

পুকুরের ধারে একটা চ্যাপ্টা পাথরে বসে, আঁজলা ভরে জল মুখে তুলে, বামুন বলল, "এই যে আমি ভাত খাচ্ছি।" তারপর আরেক আঁজলা জল মুখে তুলে বামুন বলল, "এই যে আমি বেগুন খাচ্ছি!" তারপর বলল, "এই ভাজা খেলাম! এই অম্বল খেলাম, এই দই খেলাম!" একেকটা বলে আর এক ঢোক জল খায়!

লোকে বলত ঐ পুকুরে গঙ্গা-মা বাস করেন। বামুনের দুর্দশা দেখে তাঁর বড় দয়া হল। তিনি ঐ-সব সুখাদ্য পদ্মপাতায় মুড়ে একটা মাটির হাঁড়িতে ভরে, ওর দিকে ভাসিয়ে দিলেন। বামুন অবাক হয়ে দেখল, কেউ কোথাও নেই, সরাঢাকা একটা নতুন হাঁড়ি ওর-ই দিকে ভেসে আসছে।

হাত বাড়িয়ে হাঁড়ি টেনে ডাঙায় তুলে, ঢাকনা খুলে বামুন তাজ্জব বনে গেল। হাঁড়িতে গরম গরম ঘি-ভাত, ধোঁকার ডালনা, পায়েস, পাটিসাপ্টা! একি সত্যি, না স্বপ্ন? চারদিকে তাকিয়ে

কাউকে না দেখে, বামুন বুঝল এ-সব জিনিস গঙ্গা-মায়ের দান। পেট ভরে খেয়েও সব শেষ করতে পারল না সে, মায়ের জন্য বাড়ি নিয়ে গেল।

মা তখন বাড়ি ছিল না। হাঁড়িটাকে শিকেয় টাঙিয়ে রেখে, বামুন ভর-পেটে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। মা ফিরে এসে সুগন্ধ পেয়ে, হাঁড়ি নামিয়ে দেখে, তার মধ্যে কত রকম ভালো খাবার। তাড়াতাড়ি উঠোন থেকে কলাপাতা কেটে এনে মা-ও পেট ভরে খেল।



বামুনের ঘুম ভাঙলে মাকে সে সব কথা বলল। মা বলল, "সেই ভালো, রোজ ঐ রকম করিস্, মা-গঙ্গা রোজ আমাদের খাওয়াবেন।" বামুন বলল, "যা বলেছ, কেন মিছিমিছি কষ্ট করে ভিক্ষে করব!"

তারপর থেকে বামুন আর ভিক্ষে করতে যায় না। রোজ পুকুরধারে হা-হুতাশ করে আর গঙ্গা-মা এক হাঁড়ি খাবার পাঠিয়ে দেন। মা ছেলে কোনো কাজ-কর্ম করে না, শুধু বসে বসে খায় আর মোটা হয়।

গঙ্গা-মা কিন্তু কুঁড়েমির ওপর হাড়ে চটা ছিলেন। বামুনের এই রকম আলসেমি দেখে তাঁর গা জ্বলে যেত। শেষটা আর সইতে না পেরে তাকে উচিত শিক্ষা দেবার তিনি ব্যবস্থা করলেন।

সেদিনও পুকুর পাড়ে বসে খানিকটা নাকি কান্না কাঁদবার পর, বামুন দেখল ঐ যে হাঁড়ি ভেসে আসছে! তাড়াতাড়ি হাঁড়ি টেনে নিয়ে ঢাকনি খোলবামাত্র, ভিতর থেকে কিল, চড, লাথি, ঘুষি বেরিয়ে এসে, দে-দমা-দম বামুনের পিঠে পড়তে লাগল। অগত্যা হাঁড়ির মুখে ঢাকনি চাপা দিলে পর, তবে পিটুনি থামল।

তখন বামুন ভাবল, "আমার ভাগ তো আমি পেলাম। এবার মাকেও তার ভাগ দিতে হয়।" এই ভেবে হাঁড়ি নিয়ে বাড়ি গিয়ে সেটিকে রোজকার মতো শিকেয় ঝুলিয়ে রাখল। একটু পরেই মা এসে যেই না হাঁড়ির মুখ খুলেছে, অমনি তার পিঠেও ধপাধপ লাথি ঘুষি পড়তে আরম্ভ করেছে! তাড়াতাড়ি হাঁড়ির মুখ ঢেকে মা সেটিকে উঠোনে বের করে নিয়ে এল। এদিকে ওদের বাড়ির কাছেই এক মহাজনের বাড়ি। সে রাতে সেখানে ডাকাত পড়ল। সোনা-রুপো-গয়নাগাঁটি নিয়ে ডাকাতরা বামুনদের পাঁচিল টপকে, তাদের উঠোনে এল, নিরিবিলি চোরাই মাল ভাগ করবে বলে।

হঠাৎ ডাকাতদের একজন হাঁড়িটাকে দেখতে পেল। তার বেজায় কৌতূহল হল, হাঁড়িতে কি আছে দেখতে হবে। এই ভেবে যেই না সে ঢাকনি খুলেছে, অমনি সবকটার পিঠে বে-ধড়ক লাথি ঘুষি পড়তে আরম্ভ করেছে! মারের চোটে শেষটা তারা পালিয়ে বাঁচল। হাঁড়ির মুখ খোলা রইল, তাই কিল চড় তাদের সঙ্গে গেল।

এদিকে সকালে উঠে উঠোনময় দামী দামী জিনিস ছড়ানো দেখে বামুনের আর তার মায়ের চোখ কপালে উঠে গেল। তারপর

দেবতাদের দান মনে করে, সেগুলোকে জড়ো করে, তারা বাকি জীবনটা সুখে কাটাল। তবে ঐ জিনিস বেচে যে টাকা পেল, তাই তারা ধানজমি কিনে উদয়াস্ত খাটত আর লাভের টাকা থেকে দুঃখীদের জন্য দান করত।

বারো

রাখে হরি মারে কে!

প্রত্যেক বছর কার্তিক মাসের পূর্ণিমার দিন কটকে মহানদীর ধারে এক মেলা বসে। এই মেলার নাম বালিযাত্রা। সেই সময় সেখানে দলে দলে লোক এসে জমা হয়। ভোরবেলায়, সূর্য ওঠার আগে ছেলে-বুড়ো আর মেয়েরা সবাই নদীতে স্নান করে। স্নানের পর ছোট ছোট খেলার নৌকোয় প্রদীপ জ্বেলে নদীর জলে তারা ভাসিয়ে দেয়। আলো নিয়ে সারি সারি খেলার নৌকো স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলেছে দেখতে বড় সুন্দর লাগে।

সেকালে ওড়িশার সওদাগররা কার্তিক মাসে নৌকো ভাসিয়ে সমুদ্র-যাত্রা করতেন, তাঁদের কথা মনে করেই এই উৎসব। বিদেশ থেকে তাঁরা ধন-রত্ন নিয়ে এসে দেশের সেবা করতেন।

সেকালে ধনপতি বলে একজন বিখ্যাত সওদাগর ছিলেন, দেশে-বিদেশে তিনি বাণিজ্য করতেন। বড় সাধু লোক ছিলেন তিনি, দান-ধ্যান ধর্ম-কর্মে তাঁর মন ছিল। তখন বিদেশেও ওড়িশার মিহি সুতীর কাপড় আর কাঁসা-পিতলের বাসনের আদর ছিল। সে কাপড় এতই মিহি ছিল যে একটা বাঁশের চোঙার ভিতর দিয়ে একটা গোটা শাড়ি চালিয়ে দেওয়া যেত

সেবার ধনপতি দামী দামী সুতীর কাপড়ে, কাঁসার আর রুপোর বাসনে, হাতির দাঁতের খোদাই করা জিনিসে জাহাজ বোঝাই করে ফেলেছিলেন। অনুকূল বাতাস বইতে লাগল, ধনপতি দেবতার নাম করে দেশ ছেড়ে চললেন।

মহানদী গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে; ধনপতির জাহাজ সমুদ্রের বুক চিরে ভেসে চলল। এমন সময় হঠাৎ আকাশ কালো করে ঝড় উঠল। দোতলা বাড়ির সমান ঢেউ জাহাজের ওপর আছড়ে পড়তে

লাগল। বাতাসের গোঙানিতে কানে তালা লেগে যাবার যোগাড় হল। জাহাজের মজবুত তক্তাতে চিড় ধরে গেল, খোলে জল ঢুকতে লাগল। মাঝি-মাল্লারা প্রাণপণে জাহাজটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগল। জাহাজ হাল্কা করবার জন্য রাশি রাশি দামী জিনিসপত্র জলে ফেলে দেওয়া হল, তবুও বোঝা গেল জাহাজ এবার ডুববে।

তখন ধনপতি আর তাঁর লোকজনরা প্রাণ বাঁচাবার আশায় জাহাজ ছেড়ে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়লেন। সমুদ্রে পড়ে কে কোনদিকে ভেসে গেল, নিজেরাই বুঝতে পারল না। মাঝি-মাল্লাদের কি হল ধনপতি জানতেও পারলেন না। তিনি প্রাণপণে সাঁতরে চললেন। হঠাৎ দেখলেন কাছেই জাহাজের একটা ভাঙা তক্তা ভাসছে, ধনপতি সেটিকে আঁকড়ে ধরলেন। তাতেই তাঁর প্রাণ বাঁচল।

একটু পরেই তিনি দেখলেন তাঁর চাকর বৈজুও সাঁতরে তাঁর দিকে আসছে। দুজনে তক্তাটাকে আশ্রয় করলেন। বৈজু বিলাপ করতে লাগল, "হায়, হায়, আমাদের সব গেল, আমাদের সর্বনাশ হল!"

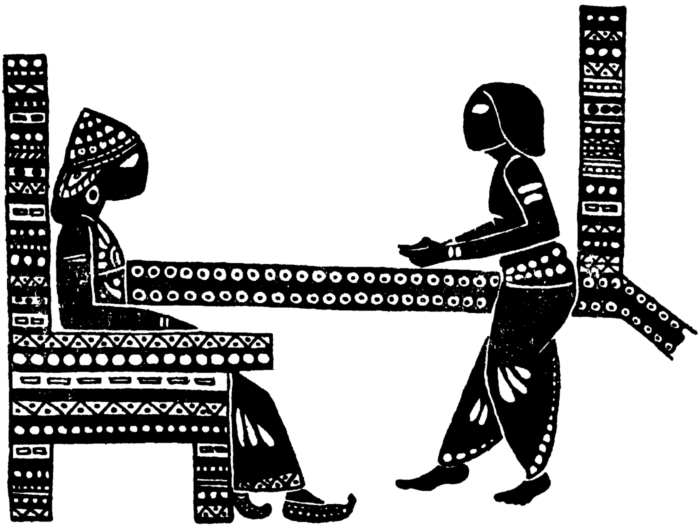
ধনপতি তাকে বললেন, "ও-কথা ব'ল না। প্রাণে তো বেঁচেছি। ভগবান যার প্রাণ রাখেন, তার কিছু হারায় না।"

সারা রাত তক্তা ধরে ওঁরা জলে ভাসতে লাগলেন। অন্ধকারে একটা হিংস্র মাছ এসে ধনপতির চোখ দুটিকে খুবলে নিল। ভোর হলে তাই দেখে বৈজু হাহাকার করে উঠল, "হায়, হায়, আমাদের সব গেল, আমাদের সর্বনাশ হল!"

চোখ হারানোর দুঃখ আর বেদনার মধ্যেও ধনপতি বললেন, "ও-কথা ব'ল না। চোখ দুটি আমার গেছে, কিন্তু প্রাণটা তো আছে। ভগবান যার প্রাণ রাখেন, তার কিছু হারায় না।

এমনি করে ভয়ে-ভাবনায় খিদেয়-তেষ্টায় কাতর হয়ে তাঁরা রাত কাটালেন। এক সময় সমুদ্রের ঢেউ তাঁদের দুজনকে এক অজানা তীরের বালির ওপর এনে ফেলল। এ কোনো নির্জন দ্বীপ নয়, দূরে শহরের হট্টগোল শোনা গেল।

ধনপতি তখন হাত থেকে হীরের আংটি খুলে বৈজুকে বললেন, "এটা নিয়ে শহরে যা। কোনো জহুরীকে দেখাস্, সে তোকে এর জন্য এক হাজার মোহর দেবে। দুজনের জন্য কিছু খাবার-দাবার কিনে আনিস্। পরে একটা ছোট জাহাজ কিনে, মাঝি-মাল্লা ভাড়া করে, দেশে ফেরা যাবে।"



আংটি নিয়ে সেই যে বৈজু চলে গেল, আর সে ফিরল না। অন্ধ ধনপতি তার আশায় পথের ধারে বসে রইলেন। তাঁর দুরবস্থা দেখে কয়েকজন পথিকের দয়া হল, তারা তাঁকে দেশের রাজার কাছে নিয়ে গেল। সব কথা শুনে রাজা ধনপতিকে বললেন, "আপনি আমার প্রাসাদে আমার অতিথি হয়ে কিছুদিন থাকুন।"

ধনপতি বললেন, "আমি আনন্দের সঙ্গে থাকব, কিন্তু এই শর্তে যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবার আগে আপনি আমার পরামর্শ নেবেন।"

শুনে রাজার ভারি হাসি পেল। আবার এ-ও মনে হল যে লোকটির কথার নিশ্চয়ই দাম আছে, নইলে এমন কথা বলবার সাহস পেত না। তিনি ধনপতির কথায় তখনি রাজি হলেন।

অনুচরদের বললেন ধনপতির থাকবার জন্য যেন খুব ভালো ব্যবস্থা করা হয়।

একদিন এক জহুরী এল রাজবাড়িতে। রাজা তার কাছ থেকে দুটি চমৎকার হীরে বসানো একটা আংটি কিনলেন, কিন্তু কিনবার আগে ধনপতিকে জিজ্ঞাসা করবার কথা ভুলে গেলেন। আংটি কেনার কথা যখন ধনপতি শুনলেন, তিনি ভারি দুঃখিত হয়ে বললেন, "আংটি কেনার আগে আমাকে বললেন না, কথা দিয়ে কথা ভাঙলেন। আমার তাহলে এখানে থাকা হয় না।"

মুচকি হেসে রাজা বললেন, "এবারকার মতো আমাকে ক্ষমা করুন, আমার একেবারেই মনে ছিল না। দেখুন আংটিটা, কেমন হীরে বলুন।"

অন্ধ বণিক আঙুলের ডগা হীরে দুটির ওপর বুলিয়ে, ব্যস্ত হয়ে রাজাকে বললেন, "এ হীরে ভারি অলুক্ষুণে, এগুলোকে এখনি দু টুকরো করে কাটিয়ে ফেলুন, নইলে ফল ভালো হবে না।"

তাই করলেন রাজা। হীরে কাটতেই ভিতর থেকে দুটো বিকট চেহারার পোকা বেরিয়ে এল। ধনপতি বললেন, "পোকা দুটোকে বনের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে দেখুন কি হয়।" পোকা ছাড়তেই বনে আগুন লেগে গেল। সে-কথা শুনে ধনপতি বললেন,

"হীরে না কাটলে, আজ রাতে রাজবাড়িতে আগুন লাগত।" ধনপতির পরামর্শের যে কত দাম, এবার রাজা সে-কথা বুঝতে পারলেন। তিনি ধনপতির জন্য আলাদা বাড়ি করে দিলেন, তাঁকে অনেক ধন-রত্ন দিলেন। এর পর তাঁকে না বলে রাজা কোনো কাজে হাত দিতেন না। ধনপতির দিন বেশ সুখেই কাটতে লাগল।

একদিন ধনপতির বাড়িতে একজন ভিখিরি এল। তার গলা শুনেই ধনপতি তাকে চিনতে পেরে বললেন, "তুমি না আমার চাকর, বৈজু? তোমার এ দশা হল কি করে?" তাঁকে দেখে বৈজুও কম চমকে যায়নি। সে ভেবেছিল তার মুনিব কোন কালে মারা গেছেন।

এখন তাঁকে এমন সুখে থাকতে দেখে তার বড় ভয় হল, এবার না আংটি চুরির সাজা পেতে হয়।

অমনি সে ধনপতির পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাইতে লাগল। দয়ালু ধনপতি বললেন, "সে কি! আমি তো কবে তোমাকে ক্ষমা করেছি। চেয়ে দেখ, ভগবান আমার ওপর কত দয়া করেছেন। মনে নেই আমি বলতাম, ভগবান যার প্রাণ রাখেন, তার কিছুই হারায় না।"

তেরো

ভগবান যা করেন

সেকালে একজন রাজা ছিলেন, তাঁর মন্ত্রী বড়ই ধার্মিক ছিলেন। প্রায়ই তিনি নানান্ তীর্থস্থানে যেতেন, প্রজাদের জন্য কীর্তন আর পালা-গানের ব্যবস্থা করতেন। ভগবানে তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল। তিনি প্রায়ই বলতেন, "ভগবান যা করেন, আমাদের ভালোর জন্যই করেন। আমরা সব সময় তাঁকে বুঝতে পারি না।" নিজের জীবনে দুঃখের সময়ও তিনি বলতেন, "ভগবান যা করেন, আমাদের ভালোর জন্যই করেন।"

একবার আম কাটতে গিয়ে রাজা বেবাৎ নিজের কড়ে আঙুলটাই কেটে ফেললেন। তাই দেখে মন্ত্রী বললেন, "এই নিয়ে দুঃখ করবেন না, মহারাজ, ভগবান যা করেন ভালোর জন্যই করেন।" রাজা এ-কথা শুনে মনে মনে খুব রেগে গেলেন, মুখে কিছু বললেন না। ঠিক করলেন মন্ত্রীকে একটু শিক্ষা দিতে হবে।

রাজধানীর কাছেই ঘন বন, রাজা মন্ত্রীকে নিয়ে সেখানে শিকার করতে গেলেন। যেতে যেতে দেখলেন একটা পুরনো কুয়ো। তার চারধারে এত লতার ঝোপ হয়েছে যে কুয়োটাকে ভালো করে দেখাই যাচ্ছে না।

কুয়ো দেখে রাজার মনে দুষ্ট বুদ্ধি এল। তিনি মন্ত্রীকে বললেন, "দেখুন তো ওটাতে জল আছে কি না। বড্ড তেষ্টা পাচ্ছে।"

মন্ত্রী যেই কুয়োর মুখের কাছে ঝুঁকে দেখতে যাবেন, পিছন থেকে রাজা তাঁকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বললেন, "এবার দেখা যাক ভগবান যা করেন, ভালোর জন্যই করেন কি না।" এই বলে তাঁর অনুচরদের নিয়ে সে জায়গা ছেড়ে চলে গেলেন।

আরো খানিকটা গিয়ে রাজা একটা বড় হরিণ দেখে শিকারীদের

নিয়ে তার পেছনে ধাওয়া করে, গভীর বনের মধ্যে গিয়ে পড়লেন। হঠাৎ মার-মার কাট-কাট করে একদল বুনো শবর তাঁদের আক্রমণ করল। মাথায় তাদের নানা রঙের চামড়ার সাজ, গলায় পুঁথির মালা, গায়ে উল্কি, হাতে তারধনুক।



সেই বিকট চেহারা দেখে রাজার লোকজন নিমেষের মধ্যে কে কোথায় পালাল তার ঠিক নেই। রাজার তো আর দৌড়-ঝাঁপে অভ্যাস ছিল না, তিনি পিছনে পড়ে রইলেন। বুনো শবররা তাঁকে ধরে, হাত-পা বেঁধে, পিঠে করে নিয়ে চলল। ঠিক হল তাঁকে তাদের দেবতার কাছে বলি দেওয়া হবে।

বলির আগে বলির পশুকে স্নান করিয়ে, সাজানো হয়। রাজার গায়ে হলুদ মাখানো হল, সিঁদুর লাগানো হল, গলায় জবাফুলের মালা পরানো হল। সব তৈরি, এমন সময় ওদের সরদার বলল, "দেখে নাও ওর শরীরের কোথাও খুঁত আছে কি না, তাহলে কিন্তু চলবে না। খুঁত থাকলে দেবী ভয়ানক চটে গিয়ে আমাদের সর্বনাশ করবেন।"

খুঁত খুঁজতে গিয়ে কাটা আঙুল ধরা পড়ল। সরদার বলল, "এ

বলিতে চলবে না। ওকে ছেড়ে দাও।" ছাড়া পেয়ে রাজা বুঝতে পারলেন মন্ত্রী ঠিক-ই বলেছিলেন, "ভগবান যা করেন, আমাদের ভালোর জন্যই করেন।" তখন তাঁর মনে ভয়ানক অনুতাপ হল। রাজধানীতে ফিরেই তিনি কুয়ো থেকে মন্ত্রীকে তুলে আনবার জন্য লোক পাঠিয়ে দিলেন।

তাদের সঙ্গে মন্ত্রী এসে পৌঁছতেই রাজা তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেন। মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, দুঃখ করবেন না। আপনিও আমাকে কুয়োয় ফেলে ভালোই করেছিলেন। শবররা আপনাকে ছেড়ে দিয়ে, ভালো বলির পশু খুঁজে বেড়াচ্ছিল। আমাকে পেলে কি আর ছেড়ে দিত? ভাগ্যিস আমাকে কুয়োয় ফেলেছিলেন, তাই ওরা খুঁজে পায়নি। ভগবান যা করেন, আমাদের ভালোর জন্যই করেন।

চোদ্দ

কিপ্টে কি করে গরীব হল

গোপি সাহু চড়া সুদে লোকের কাছে টাকা ধার দিত। এই করে করে সে অনেক টাকা-কড়ি জমি-জমা করেছিল। তবু তার টাকার লোভ গেল না, সহজে সে একটি পয়সা বের করত না।

ওর ক্ষেতে অনেক লোক মজুরি খাটত। এমন কড়া মুনিব কম দেখা যেত। ভীষণ খাটাত মজুরদের, পয়সা দিতে দেরি করত, গরীব গাঁয়ের মানুষদের কষ্ট দেখে তার একটুও দুঃখ হত না।

সুরেন বলে তার এক মজুর ছিল, তার জমি-জমা কিছু ছিল না, ঐ দিন-মজুর খেটে যা পেত, তাই দিয়ে তাকে সংসার চালাতে হত। তার ওপর গোপি সাহু মাঝে মাঝে এক সপ্তাহ দেরি করে পয়সা দিত।

একদিন ঘরে তার এক দানা চাল নেই, অথচ মুনিব বলে বসল, "আজ আমার হাতে পয়সা-কড়ি নেই। কাল দেখা যাবে।"

সুরেন বলল, "বাড়িতে এক দানা চাল, কি একটা কানা কড়ি নেই, ছেলেপুলেগুলো কাল থেকে না খেয়ে রয়েছে। অন্ততঃ এক দিনের মজুরিটা দিন।"

গোপি রেগে বলল, "যা বলছি এখান থেকে, আমাকে জ্বালাস না।" এই বলে ঘরে দোর দিল।

সেই রাতে গোপি খবর পেল বুনো শুওর এসে তার বনের ধারের ক্ষেত নষ্ট করছে। শুনেই স্ত্রীকে বলল, "তাড়াতাড়ি রান্না শেষ কর। খেয়েদেয়ে শুওর তাড়াতে যাব। চাইকি কাল হয়তো খানিকটা ভালো মাংসও পেতে পার।"

স্ত্রী বলল, "একা যেও না, কাউকে সঙ্গে নাও।" গোপি বলল, "কি বোকা তুমি! কাউকে নিলে, তাকে মাংসের ভাগ দিতে হবে না

বুঝি ? আরে ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? মাচায় বসে থাকব, বুনো শূওর আমার নাগাল পাবে না।"

বনের ধারে বটগাছের ওপর মাচা বেঁধে গোপি গিয়ে বসে রইল। মাঝরাতে হঠাৎ বুনো জন্তুর বিকট চিৎকারে তার কান ঝালাপালা হয়ে গেল। সেই সঙ্গে কিরকম যেন ঝড়ের শব্দ শোনা গেল। চোখ তুলে গোপি এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখল।

গাছের নিচেটা আলো হয়ে আছে, সেখানে দেবতাদের সভা বসেছে। ব্রহ্মা এসেছেন ; তাঁর কাছে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, এই তিন ভুবনের খবর এসে পৌঁছচ্ছে।

প্রথমেই স্বর্গের সংবাদদাতা এসে বলল, "পিতামহ, স্বর্গবাসীরা সবাই সুখে শান্তিতে আছে, এছাড়া কোনো খবর নেই।"

তারপর পাতালের সংবাদদাতা বলল, "পিতামহ, পাতালবাসীরাও সুখে শান্তিতে আছে, এছাড়া কোনো খবর নেই।"

সবার শেষে পৃথিবীর সংবাদদাতা এসে বলল, "পিতামহ, পৃথিবীর লোকরাও সুখে শান্তিতেই আছে, তবে একটিমাত্র গ্রামে একটা কিপ্টে লোকের অত্যাচারে বাসিন্দারা বড় কষ্ট পাচ্ছে। কেউ কেউ হয়তো তার ফলে মারাও যেতে পারে।"

ব্রহ্মা বললেন, "সেকি কথা ! খুলে বল।"

সংবাদদাতা বলল, "ঐ লোকটা তার মজুরদের সাত দিনের পয়সা দেয়নি। একজন মজুরের পরিবারের সাতটি প্রাণী এখনি কিছু খেতে না পেলে, মারা যাবে।"

শুনে ব্রহ্মার বড় দুঃখ হল। তিনি সংবাদদাতাকে বললেন, "এই মোহরের থলিটা ধর। ঐ গরীব মানুষটির বাড়ির চালে একটা ফুটো করে, মোহরগুলো ভিতরে ঢেলে দাও।" এর পর সভা ভঙ্গ হল, দেবতারা সবাই চলে গেলেন।

গোপিও গাছ থেকে নেমে, ভোর না হতে সুরেনের কুঁড়েঘরে গিয়ে বলল, "কাল আমার মন ভালো ছিল না, তাই তোমাকে অন্যায় কথা বলেছিলাম। সেজন্য আমি দুঃখিত। এখন এসেছি

তোমার বাকি মজুরিটা দিতে। আরেকটা কথাও আছে। অনেক দিন থেকেই ভাবছি বড়-মানুষি তো অনেক করেছি, এখন একটা কুটিরে বসে কিছু দিন ধ্যান করব। তোমার কুঁড়েঘরটা আমি চাই, তার বদলে আমার বড় বাড়িটি তুমি নাও।"

মুনিবের কথা শুনে সুরেন তো অবাক্! শেষে বলল, "অত বড় বাড়ি নিয়ে আমি কি করব?"



গোপি বলল, "না, না, আমার কথা রাখ। আজ সন্ধ্যার আগেই তোমার পরিবার নিয়ে আমার বাড়িতে চলে যেও।"

অগত্যা সুরেন রাজি হল। যেমন কথা, তেমনি কাজ। সন্ধ্যার মধ্যে গোপির বাড়িতে সুরেন আর সুরেনের বাড়িতে গোপি গিয়ে গুছিয়ে বসল।

গোপির আর তর সয় না। কখন সংবাদদাতা আসবে তার জন্য অপেক্ষা না করে, সে নিজেই একটা মই এনে তাতে চড়ে, ঘরের

ভিতর থেকে চালে একটা বড় ফুটো করে রাখল। তারপর কখন মোহর আসবে বলে সারারাত মিছিমিছি জেগে বসে রইল।

এদিকে সংবাদদাতা ঠিক-ই এসেছিল, কিন্তু ঘরের চালের ফুটো দিয়ে যেই দেখল ঘরের মধ্যে অন্য লোক, অমনি সে মোহরের থলি নিয়ে ফিরে গেল। এইভাবে এক সপ্তাহ ধরে, রোজই সে একবার এসে অন্য লোক দেখে, মোহর নিয়ে ফিরে গেল।

এর পর যখন দেবতাদের সভা বসল। ব্রহ্মা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সেই গরীব লোকটিকে মোহর দিয়েছিলে?"

সংবাদদাতা বলল, "না, পিতামহ, তার বাড়িতে গিয়ে দেখলাম সে নেই, তার জায়গায় সেই কিপ্টেটা বসে রয়েছে। মোহর পাবার লোভে সে তার সঙ্গে বাড়ি বদল করেছে। গরীব লোকটি এখন বেশ সুখেই আছে।"

এ-কথা শুনে ব্রহ্মা ভারি খুশি হয়ে বললেন,

"তা হলে তো আমাদের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে। আর মোহর দেবার দরকার নেই।"

এদিকে গোপি কুঁড়েঘরে দিনের পর দিন মোহরের আশায় বসে রইল। শেষে একদিন তার মনে হল, "তবে কি দেবতারা আমার লোভ আর নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা জানতে পেরে, আমার ওপর বিরক্ত হয়েছেন? হায়, হায়, তাহলে আমার কি গতি হবে?"

সেদিন থেকে গোপি একেবারে বদলে গেল। গরীব দুঃখীদের অনেক টাকা-কড়ি দান করে, সে দীর্ঘ দিনের জন্য তীর্থ করতে বেরিয়ে পড়ল।

পনেরো

কথা ভাঙার সাজা

সেকালে বিষ্ণু সাহু বলে একজন ধনী সওদাগর ছিলেন। তিনি যেমনি পরিশ্রমী, তেমনি হিসাবী ছিলেন। তার ফলে ক্রমে তিনি আরো বড়লোক হয়ে উঠতে লাগলেন। সকলে তাঁকে কৃপণ বলত। ছেলেপুলে কিছু ছিল না তাঁর, তবু না খেয়ে পরে কেবলি টাকা জমাতেন। কেউ যদি জানতে চাইত, "এ-সব কার জন্য জমাচ্ছেন ?" তিনি রেগে বলতেন, "যে যার নিজের চরকায় তেল দাও গে, আমার ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না।"

গাঁয়ের মধ্যিখানে পুকুর, সেখানে স্নান করতে করতে একদিন বিষ্ণু সাহু লক্ষ্য করলেন যে পাশেই একটা খেজুর-গাছে থোলো থোলো খেজুর পেকে রয়েছে। বিষ্ণু সাহু মনে মনে ঠিক করলেন দুপুরে আর কিছু না খেয়ে ঐ পাকা খেজুর দিয়ে ফলার করবেন। পেট-ও ভরবে, কিছু খরচ-ও বাঁচবে।

তারপর এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে বিষ্ণু গিয়ে গাছে চড়লেন। হাত বাড়িয়ে খেজুর তুলতে যাবেন, এমন সময় তাঁর শরীরের ভারে সরু গাছটা ভয়ঙ্কর দুলতে লাগল। বিষ্ণু বেজায় ভয় পেলেন। বাবা, ঐ অতখানি উপর থেকে পড়লেই তো হয়ে গেল! তিনি মনে মনে বললেন, "হেই ঠাকুর, আমাকে নিরাপদে নামিয়ে দাও। তাহলে আমি একশো বামুন খাওয়াব।"

তারপর তিনি ভয়ে ভয়ে নামতে লাগলেন। যখন মাটির অনেকটা কাছাকাছি এসেছেন, তখন তাঁর একটু সাহস হল। এবার তিনি মনে মনে বললেন, "আজকালকার দিনে আবার একশো বামুন কেউ খাওয়ায় নাকি! পঞ্চাশ জনকে খাওয়ালেই ঢের!"

আরো খানিকটা নেমে মনে হল, "আর ভয় নেই, এখান থেকে

পড়লেও মরব না। পঞ্চাশটা বামুন খাওয়ানো কি চাট্টিখানিক কথা! ওর অর্ধেক খরচে আমার আর আমার গিন্নির বেশ কয়েক মাস চলে যাবে। তবে কথা যখন দিয়েছি, তখন কথা রাখবই। পাঁচটা বামুন খাওয়াব।"

পা যখন প্রায় মাটি ছোঁয়-ছোঁয় বিষ্ণু সাহু মনে মনে বললেন, "পাঁচটা বামুন খাওয়ানো মানে মিছিমিছি কতকগুলো টাকা নষ্ট! একজনকে খাওয়ালেই যথেষ্ট।"

মাটিতে পৌঁছে বিষ্ণু সাহু গাঁয়ের পথ ধরলেন। যেতে যেতে ভাবতে লাগলেন কি করে সব চাইতে কম খরচে একটা বামুন খাওয়ানো যায়। ঠিক করলেন পেট-রোগা কাউকে নেমন্তন্ন করবেন, সে বেশি খেতেই পারবে না।

হঠাৎ গোবিন্দ মিশ্রের কথা মনে পড়ল, তার তো অম্বলের ব্যামো লেগেই থাকত। তাকেই বিষ্ণু নেমন্তন্ন করলেন।

নেমন্তন্নর দিন বিষ্ণুকে বিশেষ কাজে বেরিয়ে যেতে হল। যাবার সময় গিন্নিকে বলে গেলেন, "আজ বামুনটি খেতে আসবে। দেখো, তাকে ভালো করে খাইও আর দু তিনটে পয়সা দক্ষিণা দিও। মনে রেখো, তাকে খুশি করে দেওয়া চাই।"

যথা সময় গোবিন্দ এসে বলল, "আমার পেটে ব্যথা, আমি খাবটাব না। আমার দক্ষিণাটি দিয়ে দাও, একশোটা রুপোর টাকা।"

বিষ্ণুর স্ত্রী হাঁ করে চেয়ে রইল। লোকটা বলে কি!

গোবিন্দ মিশ্র বলল, "আমি খাব না, তাই ভালো দক্ষিণা চাই। বামুনকে ডেকেছ যখন, ওটুকু তোমার কর্তব্য। তাছাড়া ওটা না দিলে আমি এখান থেকে উঠব না।"

গোবিন্দর স্ত্রী মহা মুশ্‌কিলে পড়ে গেল। হঠাৎ মনে হল স্বামী বলে গেছেন বামুনকে খুশি করা চাই। অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে একশোটা টাকা দিয়ে বিদায় করতে হল।

ফিরে এসে সব কথা শুনে বিষ্ণু সাহুর চক্ষুস্থির। প্রথমে

গিন্নিকে খানিকটা গালি-গালাজ করলেন। তারপর ঠিক করলেন। গোবিন্দর কাছ থেকে টাকাটা ফিরিয়ে আনতে হবে।



দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়ে গোবিন্দ অসুখের ভান করে, মাদুর জড়িয়ে রইল। স্ত্রীকে শিখিয়ে দিল, "তুমি খানিকটা কাঁদাকাটা কর। ওকে বল আমার বড় অসুখ" বিষ্ণু এসে পৌঁছতেই গোবিন্দর স্ত্রী ডুকরে কেঁদে বলল, "হায়! হায়! এখন আমার কি হবে গো! বারবার বললাম, কিপ্টের বাড়িতে খেও না, তা কে কার কথা শোনে! কে জানে কি ছাই খেয়ে এসেছে! এখন আমার এ কি সর্বনাশ হল গো!"

ওর কান্নাকাটি শুনে ভিড় জমে গেল। বিষ্ণুর হল বিপদ। এক দিকে গোবিন্দর স্ত্রী বলতে লাগল, "আমি এমনি এমনি ছেড়ে দেব না। রাজার কাছে গিয়ে নালিশ করব!" অন্য দিকে পাড়ার লোকেরা বলতে লাগল, "মুখপোড়া কিপ্টে কোথাকার, কি না কি খাইয়ে বামুনটার এই হাল করেছে!"

হঠাৎ বিষ্ণুর মাথায় একটা বুদ্ধি এল। হাত থেকে সোনার আংটি খুলে গোবিন্দর স্ত্রীকে দিয়ে বললেন. "চুপ কর, দোহাই

তোমার! এই নাও, এবার থামো দিকিনি!" এই বলে সেখান থেকে চোঁ-চাঁ দৌড় মারলেন।

গোড়াতেই যদি তাঁর কথা মতো একশো বামুনকে খাওয়াতেন, তাহলে এর চাইতে কম খরচে হত।

ষোল

রামধল

সেকালের ওড়িশা একটা রাজ্য ছিল না, সেখানে অনেকগুলি ছোট ছোট রাজা রাজত্ব করতেন। রামধলের বড় ভাই এই রকম একজন ছোট রাজা ছিলেন। দাদার প্রাসাদে মহাসুখে থাকত রামধল। উপাদেয় খাওয়া, শৌখিন সাজ-পোশাক, খোশামুদে সঙ্গী, কোনোটার তার অভাব ছিল না। কোনো ভাবনা-চিন্তাও ছিল না তার. পরে কি হবে ভেবেও দেখত না সে।

সুখের দিন সব সময় সমান যায় না। রামধলের দাদা হঠাৎ মারা গেলেন। তাঁর জায়গায় যিনি রাজা হলেন, তিনি ছিলেন নিষ্কর্মা রামধলের ওপর হাড়ে চটা। শুধু চটাই নন, তার ওপর তাঁর সন্দেহ হত রামধলের নিশ্চয়ই সিংহাসনের ওপর লোভ আছে, সুবিধা পেলেই সে ষড়যন্ত্র করবে।

নতুন রাজা রামধলের মাসোয়ারা বন্ধ করে দিলেন। রামধলের অনুচররা আর বন্ধুরা গতিক দেখে যে যার সরে পড়ল। শেষটা খাওয়া-পরা চলে না. এমন অবস্থা। রামধলের স্ত্রী ভারি বুদ্ধিমতী মেয়ে ছিল। সে বলল, "বোঝাই যাচ্ছে নতুন রাজা আমাদের তাড়াতে চান। দেখ, এখানে থাকা খুব নিরাপদ নয়। এমনিতেই তো না খেয়ে মরতে হবে, তার চাইতে চল, পাশের রাজ্যে যাই। সেখানে কেউ আমাদের চেনে না, খেটেখুটে খেতে পারব।"

অন্ধকার রাতে দুজনে রাজবাড়ি ছেড়ে চলে গেল। সারা রাত হেঁটে. ভোরে তারা পাশের রাজ্যে পৌঁছে গেল। তবু থামল না ওরা, হেঁটেই চলল। বেলা দুপুর হল, মাথার ওপর ঝাঁ-ঝাঁ রোদ, খিদেয় তেষ্টায় দুজনে কাতর, আর হাঁটতে না পেরে, পথের ধারে একটা ছোট নদীর তীরে ওরা বসে পড়ল।

এমন সময় একটা লোক হেঁকে গেল, "মুড়ি চাই! গরম মুড়ি! টাটকা মুড়ি!" একটা পদ্মপাতায় করে দু পয়সার মুড়ি কিনল ওরা। খিদে খুবই পেয়েছিল, কিন্তু সারা গায়ে ধুলো মেখে কিছু খেতে ইচ্ছা করল না। পাতা ঢাকা দিয়ে মুড়ি রেখে, ওরা জলে নামল।

এমন সময় একটা বিষধর সাপ এসে মুড়িতে মুখ দিয়ে, খানিকটা বিষ ঢেলে দিয়ে গেল। একটু পরে ঐ পথ দিয়ে রাজার হাতি যাচ্ছিল, মুড়ি দেখে তার বড় লোভ হল। সবটুকু সে চেটেপুটে খেয়ে ফেলল।

ঠিক সেই মুহূর্তে রামধন আর তার স্ত্রী স্নান সেরে এসে দেখল একটা হাতি তাদের খাবার খেয়ে নিচ্ছে। রাগে অন্ধ হয়ে রামধন হাতির পেটে দুটো কিল মারল। হাতি দু পা হটে গিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে মরে পড়ে গেল। মাহুত-ও যেমন অবাক্, রামধন-ও তেমনি। তারা তো আর জানে না মুড়ির সঙ্গে হাতি সাপের বিষ খেয়েছে, দুজনেই মনে করল কিল খেয়ে হাতি মরেছে।

মাহুত মনে মনে বলল, "ওরে বাবা! এ লোকটার গায়ে কি জোর! একটা কিল মেরে অত বড় হাতিটাকে ঘায়েল করল! প্রাণ নিয়ে পালাই, বাবা।"

ছুটতে ছুটতে মাহুত সটাং রাজার কাছে গিয়ে বলল, "মহারাজ, অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখে এলাম! এক কিলে একটা লোক আপনার অতবড় হাতিটাকে মেরে ফেলল!"

শুনে রাজাও ভারি আশ্চর্য হলেন। একটা হাতি গেছে বলে তিনি খুব ব্যস্ত হলেন না, তাঁর আরো কত হাতি ছিল। তিনি ভাবলেন, "এই লোকটাকে একবার দেখতে হচ্ছে। একে আমার অনুচর করে রাখলে, শত্রুরা আমার কিছুই করতে পারবে না।"

পাইক পেয়াদাদের বললেন, "যা তো, যে হাতি মেরেছে সেই লোকটাকে আমার কাছে নিয়ে আয়, ওকে আমাদের কাজে বহাল করতে হবে। দেখিস্ আবার অসম্মান করে কিছু বলিস্-টলিস্ না, তাহলে রেগেমেগে যদি—আচ্ছা যা, রাজছত্র, রুপো বাঁধানো পাল্‌কি নিয়ে, ঢাক ঢোল বাজিয়ে তাকে নিয়ে আয়।"

রামধন প্রথমটা যেমন ঘাবড়ে গেছিল, পরে নিজের খাতির দেখে তেমনি আশ্চর্য হয়ে গেছিল। রাজা তাকে খুব সমাদর করে অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন, "তোমার মতো একজন পালোয়ান যদি আমাদের দলে থাকে, আমাদের সুখের সীমানা থাকবে না। তোমার জন্য আলাদা মহলের ব্যবস্থা করব, টাকাকড়ি লোকজন দেব। কেমন, থাকবে তো?"

যদিও রামধন খুব অবাক হয়েছিল, তবু থাকবে না-ই বা কেন? সে বলল, "মহারাজ, আপনার কাজ করতে পারাকে আমি পরম সৌভাগ্য বলে মনে করি।"

তখন থেকে রামধন আর তার স্ত্রী রাজধানীতে পরম সুখে থাকতে লাগল। দেশের লোক তাকে ভারি সম্মান দেখাত, এক কিলে হাতি মারা তো চাট্টিখানি কথা নয়।

এদিকে হয়েছে কি, অনেকদিন থেকেই পাশাপাশি দুই রাজ্যের মধ্যে সীমান্তের কয়েকটা গ্রাম নিয়ে ঝগড়া চলছিল। এবার একেবারে খোলাখুলি যুদ্ধ বেধে গেল। দুই রাজ্যের সমান সৈন্য



বল, সমান ক্ষমতা, কিন্তু রামধনের মুনিব ভাবলেন, "এবার আমাকে

পায় কে। একা রামধনের সাহায্যেই আপদগুলোকে এমন শিক্ষা দেব যে পালাবার পথ পাবে না !"

রামধনকে ডেকে বললেন, "তোমাকে আমার প্রধান সেনাপতি করে দিলাম। ব্যাটাদের তুলো-ধুনো করে দিয়ে এসো।"

রামধন পড়ল ফাঁপরে। যুদ্ধ, যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, চোখেও দেখেনি কখনো। অগত্যা স্ত্রীকে গিয়ে বলল, "এবার কি হবে? তোমার কথামতো দেশ ছেড়ে এখানে এলাম। এখন যুদ্ধে গেলে শত্রুরা মারবে, না গেলে রাজা মারবে। আমি তো এদিকে তলোয়ারের আগা-পাছাও চিনি না !"

স্ত্রী বলল, "এতে ভয়ের কি আছে বুঝলাম না। যাও, রাজাকে বল তোমাকে একটা বুনো ঘোড়া দিতে, যার পিঠে কখনো জিন পড়েনি, আর একটা তলোয়ার আর লম্বা একগাছা দড়ি দিতে। তারপর কি করতে হবে, আমি বলে দেব।"

রামধন ঐ সব জিনিস রাজার কাছ থেকে চেয়ে আনল। আসবার সময় বলে এল, "কাল সকালে আমি একা আগে আগে যাব। সেপাই-সান্ত্রীরা যেন খানিকটা তফাত রেখে, পিছনে পিছনে আসে।"

পরদিন ভোরে রামধনের স্ত্রী উঠে স্নান করে পুজো সেরে নিল। তারপর রামধনের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে দেবতাদের কাছে জয় ভিক্ষা করল।

তারপর গিয়ে স্বামীকে সে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে, তার পা দুটোকে আচ্ছা করে ঘোড়ার গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধল। তারপর স্বামীর হাতে তলোয়ার দিয়ে, পিছন থেকে ঘোড়াটার পিঠে বেদম চাবুক মারল। ক্ষেপে গিয়ে বাতাসের বেগে ঘোড়া ছুটল। খানিকটা তফাতে দামামা বাজিয়ে রাজার সৈন্য চলল। সেই শব্দে ভয় পেয়ে ঘোড়া আরো জোরে দৌড়তে লাগল।

সামনে পাশাপাশি দুটি তালগাছ, মাঝখানে একটু ফাঁক। ঘোড়া সেই ফাঁকের ভিতর দিয়ে পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে গেল। যাবার

সময় ভয়ের চোটে রামধন দুই হাতে গাছ দুটোকে জাপটে ধরল। বুড়ো ফোঁপরা গাছ, সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে এল।

সামনে থেকে শত্রুরা দেখল প্রকাণ্ড একটা তেজী ঘোড়া ছুটে আসছে, তার পিঠে বেপরোয়া এক বীর, দুই বগলে দুটো তালগাছ নিয়ে তেড়ে আসছে! আর কি তারা সেখানে থাকে! পিছন ফিরে উঠি-পড়ি করে সবাই দৌড় মারল। রামধনের ঘোড়া আর সৈনিকরা পিছু পিছু ধাওয়া করল। অনেক শত্রু মরল, অনেক পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল।

বিজয় গর্বে রামধন রাজধানীতে ফিরে এল। রাজা তাকে নানান উপাধি আর প্রচুর টাকাকড়ি দিলেন।

সতেরো

সংসারের চার নিয়ম

ওড়িশায় মধুপুর বলে একটি গ্রাম আছে. সেখানে বহুকাল আগে হরিহর বলে একজন ব্রাহ্মণ থাকত। তার বাপ মারা যাবার সময় কিছু জমিজমা রেখে গেছিল বটে, কিন্তু হরিহর ছিল বেজায় কুঁড়ে। সে কোনো কাজ-কর্ম করত না, একটু একটু করে জমি বেচে খেত। শেষটা আর একটুও জমি বাকি রইল না, তখন আর তার স্ত্রীর না খাবার যোগাড় হল।

স্ত্রীর নাম ছিল বাসন্তী, অভাবে অভাবে তার মেজাজ বড় খিটখিটে হয়ে গেছিল। উঠতে বসতে সে তার স্বামীকে খোঁটা দিত, "কুঁড়ের হদ্দ! কাজ করে না! নিজের পরিবারকে খেতে দেয় না!" দিনে দিনে তার কথাগুলো আরো বেশি ধারালো হয়ে উঠতে লাগল। শেষটা আর সইতে না পেরে, হরিহর একদিন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

ঘুরতে ঘুরতে, শেষে একদিন তার একজন ঋষির সঙ্গে দেখা হল। ঋষি তার শুকনো মুখ আর কোটরে বসা চোখ দেখেই, তার অবস্থাটা বুঝতে পারলেন। তাঁর ভারি দয়া হল, হরিহরকে তিনি নিজের আশ্রমে নিয়ে গেলেন। সারা দিনে ঋষি যা কিছু ভিক্ষা পেতেন, তাই দিয়েই দুজনের চলে যেত।

এইভাবে দিন কাটতে লাগল। কিন্তু হরিহরের কুঁড়ে স্বভাব দেখে ঋষির হাড় জ্বলে যেত। একদিন তিনি হরিহরকে বললেন, "দেখ বাপু, কুঁড়েমি করা কোনো কাজের কথা নয়। একটু চেষ্টা করলেই তুমি করে খেতে পার। এখন আমি যা বলছি মন দিয়ে শোন, তাহলে তোমাকে কখনো অভাবে পড়তে হবে না। এই চারটি নিয়ম শিখে রাখ :

ডোমের মতো খাটবে,

রাজার মতো খাবে,

মেয়েদের কাছে সত্যি কথা বলবে না,

রাজার কাছে মিথ্যা কথা চলবে না।"

নিয়ম চারটিকে হরিহর মুখস্থ করে ফেলল। মনে মনে বলল, "এই চারটে নিয়ম কি কখনো ভুলতে পারি? ঋষিমশাই বলেছেন এগুলোর সাহায্যে আমি যত খুশি খেতে পরতে পাব। এর জন্য আমার কপাল খুলে যাবে!"

এই ভেবে হরিহর আশ্রম থেকে বেরিয়ে শহরের পথ ধরল। একটা গ্রামের কাছে এসে দেখে বেজায় ভিড় জমেছে। ব্যাপার কি? না, পথের ধারে একটা মানুষ মরে পড়ে আছে। গ্রামের প্রধান মহাসমস্যায় পড়েছিল, লোকটার কি জাত কেউ জানে না, এখন একে পোড়াবার ব্যবস্থা কি করে হয়? অথচ পথের ধারে ওভাবে ওকে ফেলেও রাখা যায় না।

সব শুনে হরিহরের হঠাৎ ঋষির কথাগুলো মনে পড়ে গেল। সে এগিয়ে গিয়ে বলল, "আমি ওকে পোড়াবার ব্যবস্থা করব। তোমরা আমাকে কত টাকা দেবে?"

গাঁয়ের লোকেরা তাই শুনে মহাখুশি হয়ে, চাঁদা করে তখনি পাঁচ টাকা তুলে হরিহরকে দিল। হরিহর মড়া কাঁধে করে শ্মশানে গেল। একাই সব যোগাড় করে, চিতায় আগুন জ্বালতেই, লোকটার মাথার জটার মধ্যে থেকে অনেকগুলো মোহর গড়িয়ে পড়ল। লোকটা আসলে চোর ছিল, জটার মধ্যে চোরাই-মাল লুকিয়ে রাখত।

মোহর পেয়ে হরিহরের অবস্থা ফিরে গেল। মনে মনে ঋষি মশাইকে শত শত প্রণাম জানিয়ে, নিজেদের গ্রামে সে ফিরে গেল। ওকে ফিরে আসতে দেখে ওর স্ত্রীও খুব খুশি হল। টাকাগুলো ওরা উড়িয়ে পুড়িয়ে দিল না, বরং সাবধানে খরচ করতে লাগল। তবে খাওয়া-দাওয়া করত ভালো। ওদের ভালো খাওয়া-দাওয়া দেখে গাঁয়ের লোকের চোখ টাটাত।

তারা বলাবলি করত, "আচ্ছা, দুদিন আগেও তো হরিহর বেজ গরীব ছিল, এখন হঠাৎ এত ভালো খায় কি করে? কোথায় টা পায়?" এ-কথার কোনো উত্তর পাওয়া যেত না, হরিহর আজক বুঝে সুঝে কথা বলত।

বাসন্তীর একজন বন্ধু ছিল, তার নাম নীলাম্বরী। সে রো বাসন্তীকে পীড়াপীড়ি করে, "কোথায় টাকা পেলি বল্।" শেষ বাসন্তী বলল, "কাল সকালে এসো, সব বলব।"



সেদিন রাতে হাঁড়িমুখ করে বাসন্তী তার স্বামীকে বলল, "কোথায় টাকা পেলে আমাকে বল না কেন? এটা কি তোমার উচিত হচ্ছে?"

ঋষিমশায়ের তৃতীয় নিয়ম মনে পড়তেই, হরিহর বলল, "দেখ, কাউকে বল না, কিন্তু বিষাক্ত কুঁচ-ফলের সঙ্গে গুড় মিশিয়ে খেলে মুখ দিয়ে সোনার ফলা পড়ে। এ-কথা পাঁচ কান কর না যেন।"

বলা বাহুল্য পরদিনই বাসন্তী নীলাম্বরীকে কথাটা বলে ফেলল। নীলাম্বরী সেই রাতে তার স্বামীকে বেশ খানিকটা কুঁচ-ফলের সঙ্গে গুড় মিশিয়ে খাইয়ে দিল। কয়েক ঘণ্টা পরে ভয়ানক কষ্ট পেয়ে সে বেচারা মারা গেল। নীলাম্বরী এতক্ষণ হাঁ করে বসে দেখছিল সোনার ফলা কখন পড়ে। এবার সে ডুকরে কেঁদে উঠল।